রবীন্দ্রনাথ
ও
চার অধ্যায়

শুভব্রত রায়চৌধুরী

तमसो मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN

081.013(04)
Su 15

280054

রবীন্দ্রনাথ ও চার অধ্যায়

শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ ভাদ্র ১৩৮৬ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৯

প্রচ্ছদ : সুবিমল লাহিড়ী

প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস । ৩০ বিধান সরণী । কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

ভূমিকা	[৭]
পটভূমি	১
জীবনবাদ	৫
কাহিনী	২৪
এলা	৩৮
অতীন্দ্রনাথ	৫২
ইন্দ্রনাথ	৮৭
মূল্যায়ন	১০৭

উৎসর্গ

তপতী-কে

সিংহল। ১৯৩৪

ভূমিকা

লেখকের সাহিত্যপ্রয়াস আরম্ভ হয় 'মৈত্রেয়ী' নামে একটি নাটক দিয়ে। এই প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদে পূত। 'মৈত্রেয়ী'-র অনুগামী 'উদ্বোধন' এবং 'গ্রীকদর্শন'। তার পর কেমন যেন সব উলট-পালট হতে শুরু করল। জীবনপথে মোড় ফিরতে লাগল একটার পর আর-একটা। চলতে চলতে পড়ন্ত বেলায় লেখকের হুঁশ হল সাহিত্যপ্রয়াস থেকে সে অনেক দূরে সরে এসেছে। অনুতপ্ত মন। গুরুদেবের আশীর্বাদের মর্যাদা দেওয়া হয় নি। স্বধর্মভ্রংশের গ্লানিবোধ জাগল। তখন শুধু একটা বাসনা, সাহিত্যপ্রয়াসে ফিরে যাওয়া। এই প্রয়াসের ফল বর্তমান গ্রন্থ। লেখকের গুরুপ্রণাম।

১৯৩৬ সাল। লেখক তখন চট্টগ্রামে, দশম শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময়ে পরিচয় হয় 'চার অধ্যায়'-এর সঙ্গে। পরিচয় ক্রমশ গভীর অনুরাগ হয়ে ওঠে। লেখকের কাছে চার অধ্যায় শুধু একটি কাহিনীমাত্র নয়, সকল স্বভাবহন্তা স্বধর্মভ্রষ্ট মানুষের অন্তিম হাহাকারের বাণীরূপ। **Angst** বা **anguish** আধুনিক অস্তিবাদের একটি মৌলিক ধারণা। তার উৎস হল : স্বভাবহন্তার প্রাণ-পোড়ানো যন্ত্রণা, লক্ষ্যহীন অর্থহারা অস্তিত্বের নেতিসঞ্জাত যন্ত্রণা, সত্তার পথসন্ধানের আর্তি। চার অধ্যায় এই যন্ত্রণার দুঃসহ-করুণ অভিজ্ঞতার স্বরমূর্ছনা। উপন্যাসখানি শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন বিশ্বসাহিত্যেও একটি অনন্য সৃষ্টি। মানুষের মধ্যে যতদিন স্বভাবহননের যন্ত্রণা, দুর্গত অস্তিত্বের নিঃসার্থকতা, আলোকচোরার শ্বাস-চাপা প্রভাব অনুভূত হবে ততদিন চার অধ্যায় মানবমনের গোপনবাসীর 'একটি কান্না-ধন' বলে বুক জুড়ে রইবে। শাশ্বত সাহিত্য নিত্য-সত্যকে খোঁজে। মনুষ্যত্বের পতন-অভ্যুদয়ের অন্তর্বার্তা তার প্রাণরস। সে চিরকালের সমকালীন।

দেশের আত্মা আছে এ কথা যেমন সত্য দেশাত্মা ও মানবাত্মার প্রভেদও তেমনি সত্য। রবীন্দ্রনাথ ভারতাত্মার উদ্‌গাতা বলে বহুল পরিচিত। কিন্তু পরিচয়টি আংশিকমাত্র। তাঁর লক্ষ্য :

"দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

দেশাতিক্রান্ত দেশেই মানবাত্মার মন্দির। সেখানে 'পরমাত্মীয়' অধিষ্ঠিত। সে-ই মানবাত্মার প্রাণ। তাকে বাদ দিলে মানবাত্মা শুধু বিমূর্ত-ভাবকল্প। এই পরমাত্মীয় মানবাত্মা ভোরের বেলায় কখন কবিকে পরশ করে হেসে চলে গেছে, সেই হতে তার গান গেয়ে কবি সারা জীবন তাকেই খুঁজে ফিরেছেন। কতই নামে তাকে ডেকেছেন, কতই ছবি তার এঁকেছেন। তাই রবীন্দ্রসৃষ্টির মধ্যে এত বৈচিত্র্য, এত প্রসার, এত গভীরতা। সৃষ্টির ধর্ম বৈচিত্র্যমুখী, কিন্তু তার অন্তরে একটা সমন্বয়সূত্র থাকে। রবীন্দ্রসৃষ্টির সমন্বয়সূত্রটির পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ আজও বোধ হয় সম্পূর্ণভাবে নির্ণীত হয় নি। তবে এটা ঠিক যে, স্বরূপনির্ণয়ের অপরিহার্য আশ্রয়বাক্য হল কবিব্যাখ্যাত মানবাত্মার ধীকল্প। মানবাত্মা তাঁর ধর্ম তাঁর সাধনার ধন। তাঁর চিন্তায় মানবাত্মা এক অভিনব রূপ পেয়েছে: "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ ব্যক্তিগত মানকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব।"[১] নিখিল মানবের আত্মার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে করতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন: "তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতি-মানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই।"[২]

পাশ্চাত্য দর্শন মানবাত্মার অন্বেষণে প্রতিশ্রুত। সেখানে Quality of Life একটি প্রধান বিচার্য বিষয় বলে গৃহীত হয়েছে। জীবনের ঋদ্ধি এবং মানবাত্মার উপলব্ধির সঙ্গে নাড়ীর যোগ। বিমূর্ত মানবাত্মা দেহহীন লাবণ্যবিলাস-মাত্র। তার যাথার্থ্য জনাত্মায় মূর্ত। তার প্রকাশের পথ: ব্যক্তি-মানুষের অসংখ্য সামাজিক বন্ধন। সমাজ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একসঙ্গে চলা। একসঙ্গে-চলায় আছে একপ্রাণতার সৃজন-সম্ভাবনা। সেখানে মানবাত্মার সার্থক প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, মানুষের মধ্যে "স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি সেই-আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। একলা আমির কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি।"[৩] যেখানে একপ্রাণতা ক্ষুণ্ণ যেখানে স্বার্থগত

১. ভূমিকা, 'মানুষের ধর্ম', র-র ২০, পৃ. ৩৭১

২. তদেব, পৃ. ৪৩০

৩. তদেব, পৃ. ৪০৮

আমির প্রতাপ, সেখানে মানবাত্মা অপ্রকাশের দৈন্যে নঞর্থক। মানবাত্মার স্বীকরণে এক যেমন সত্য বহুও তেমনি সত্য; বৃহৎ যেমন যথার্থ ক্ষুদ্রও তেমনি যথার্থ। এক-এর মধ্যে বহু যুক্ত, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ মূর্ত।

ব্যক্তিসত্তার সমাজাত্মিক রূপ মানবমুখী দর্শনের ভিত্তি। সেইজন্য দর্শন ও সমাজতত্ত্বের পরস্পরনির্ভরতা এ যুগের দার্শনিক মননশীলতার একটি বৈশিষ্ট্য। যে দর্শন শুধু আকাশবিলাসী সে শূন্যে চলে। মাটির মানুষের দিকে দৃষ্টি দেবার মতো মন কোথায়। মানব-শ্রেয়ের সন্ধান দেবে কী করে। সে পথপ্রদর্শক হলে ফল হবে অন্ধেন নীয়মানাঃ। ব্যক্তিচেতনা বিকাশ লাভ করে সমাজচেতনার স্তন্যসুধা পান ক'রে। চিহ্নহারা পথে তার যাত্রা শুরু। অচেনাকে চিনে চিনে তার জীবন ভরে ওঠে। কত অচিন ডোর! মা ছিল অচেনা, যখন কোলে তুলে নিল প্রেমের সঙ্গে তার চেতনার প্রথম প্রেমের ডোর। সকল প্রেমই তো এমনতরো অচেনা। অচিন প্রেমের প্রকাশ কত বিচিত্র। তারই খোঁজে হৃদয় কেবলি দুলে ওঠে। সে দোলা কি থামতে চায়। তাই তার চেতনার গান:

"অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে।"

এটা হল Social nature of the self। জনাত্মার সমাজাত্মিক স্বভাব। এই স্বভাব-গঠনের বর্ণনায় Maurice Roche বলেছেন: "Thus persons can be held to be social entities in as much as they have the consciousness of themselves as selves, existing in the midst of, and relating to, and with, other selves. The sociality, this consciousness of being one self among many, arises socially, through the person growing from infancy under the influence of other selves."[১] ব্যক্তিমানুষ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-আদান-প্রদান-বেদন-নিবেদনের মাধ্যমে অচেনাকে চিনতে থাকে, সমাজাত্মিক হয়ে ওঠে। 'তুমি-সে'-র সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়ে 'আমি' অভিব্যক্ত। অভিব্যক্তি পূর্ণতা পায় মানবাত্মায়।

---

১. *Phenomenology, Language and the Social Sciences*, Routledge & Kegan Paul, London, 1973, p. 298

সমাজদর্শন ও আত্মদর্শন রবীন্দ্রচিন্তায় একান্তভাবে পরস্পরাশ্রয়ী। সমাজক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কের শিরায় শিরায় মানবাত্মার প্রাণস্পন্দন। এই প্রাণস্পন্দন অনুভব করা ব্যক্তিমানুষের ধর্ম : 'আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে' ; 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।' তার চৈতন্যের চরম উপলব্ধি : 'তুমি যে আমারে চাও, আমি সে জানি।' মানবাত্মার সঙ্গে জনাত্মার যোগ নিবিড় প্রেমের যোগ যেখানে প্রেমী ও প্রেমাস্পদ সমাত্ম, অভেদাত্ম নয়। এটাই প্রেমের প্রকৃতি।

কেন এই প্রেমের সত্য বর্তমান সভ্যতায় অবহেলিত? কবি বলেছেন : "মানুষের সব চেয়ে বড়ো ধর্ম সমাজধর্ম, লোভরিপু সব চেয়ে তার বড়ো হন্তারক। এই যুগে সেই রিপু মানুষের সমাজকে আলোড়িত করে তার সম্বন্ধবন্ধনকে শিথিল ও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।"[১] লোভরিপুর প্রভাব তো চিরকাল ধরেই চলে আসছে। তবে এমন কী ঘটল যার ফলে বর্তমানে এটা এমন রক্তবীজের মতো বিক্রমী ও অবিনাশী হয়ে উঠেছে? কারণ-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন : "In the modern civilisation, for which an enormous number of men are used as materials, and human relationships have in a large measure become utilitarian, man is imperfectly revealed. For man's revelation does not lie in the fact that he is a power, but that he is a spirit."[২]

মানুষের পরিচয় জৈবিক ক্ষমতায় নয়, তার আত্মশক্তিতে— যার মূলধন হল moral responsibility, নৈতিক দায়িত্ববোধ। মানুষের অন্তরে আছে আত্মীয়তার আকাঙ্ক্ষা প্রেমের আকৃতি। দায়িত্ববোধ ছাড়া প্রেম আত্মীয়তা এই শব্দগুলি নিরর্থক। দায়িত্ববোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আত্মকর্তৃত্ব। যার আত্মকর্তৃত্বের অধিকার নেই তার দায়িত্ব কোথায়। জন্তু কি কখনো 'দায়ি' হতে পারে। দায়িত্ববোধ একান্তভাবেই মানবিক। নিজের স্বেচ্ছাকৃত কাজের জন্য দায়িত্ব একটি দুর্বহ ভার। মানুষ এ ভার বহন করার শক্তি রাখে। কিন্তু যেখানে

১. রাশিয়ার চিঠি, র-র ২০, পৃ. ৩৩৬

২. "The Modern Age", *Creative Unity*, Macmillan & Co Ltd., Calcutta, 1950, pp. 125-26

সে কেবল জৈবিক ক্ষমতার আধার, নিছক productive power বলে গণ্য, সেখানে কোথায় তার আত্মকর্তৃত্বের অধিকার। সেখানে যন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়। বস্তুত যজমানী সভ্যতায় সাফল্যের মাপকাঠি হল, কত দক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'organises men into machines'। মানুষ উৎপাদনের উপাদানমাত্র, ব্যবস্থাপনাতত্ত্বে যাকে বলা হয় human resources। এটাই তার reified অবস্থা দারুভূত রূপ। তার মান মজুরি নির্ধারিত হয় উপযোগিতার দাঁড়িপাল্লায়। 'মানুষ-ছাঁকা' সভ্যতায় (Social Darwinism-এর ভাবদ্যোতক নয় কি।) তার বাঁধন দরকারের বাঁধন। যে দরকারে লাগে সে সচল, যে লাগে না সে অচল বাতিল। এই প্রয়োজনতত্ত্বে মানুষের এমন হাল যে তার নামটাও বাহুল্য বোধ হয়। একটি সংখ্যা, একটি রুক নম্বর হলেই হল ; কাজ চলা নিয়ে কথা। বিশুর কথা মনে পড়ে : "আমি ৬৯ ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।"[১] উপযোগের জাদুতে মানুষের আত্মকর্তৃত্বের অধিকার রূপান্তরিত হয়েছে 'দাসত্বের রজ্জুতে'।

যেখানে উপযোগ পরম শ্রেয়ের আসন পায়, মানবিকতা সেখানে স্বকীয় যাথার্থ্য হারিয়ে ফেলে ; শিরদাঁড়াহীন লতার মতো উপযোগের বটবৃক্ষকে জড়িয়ে ধরে থাকে। তার মুখে বেন্থাম-বাণীর শেখানো বুলি : "Utility is the supreme object which comprehends in itself law, virtue, truth and justice." ইউটিলিটির এই সর্বগ্রসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ : "The fragmentariness of utility should never forget its subordinate position in human affairs. It must not be permitted to occupy more than its legitimate place and power in society, nor to have the liberty to desecrate the poetry of life, to deaden our sensitiveness to ideals, bragging of its own courseness as a sign of virility."[২] উপযোগের উপযোগিতা

১. রক্তকরবী, পৃ. ২৯

২. "The Modern Age", *Creative Unity*, 1950, p. 118

আছে সন্দেহ নেই। তবে, এলার ভাষায়, তার 'স্বভাবে অনেকখানি মাংস, অনেকখানি ক্লেদ'। প্রশ্রয় পেয়ে 'অক্টোপস জন্তুর মতো' 'আটটা চট্‌চটে পা বের করে' সে ছিন্নবাঁধা ছুটে যায় মানবমূল্যবোধের দিকে, তাকে 'অসম্মানে ঘিরে' ফেলবার দুর্বার বাসনা নিয়ে। সীতাপহারী দশানন। মায়াজালবেষ্টিত-অশোক-কানন হতে আস্তর শ্রেয়ঃপ্রেয়কে উদ্ধার করবে কে!

উপযোগের মূল্য ব্যবহারিক। কিন্তু সে চায় পরমাত্মিক মূল্যবোধের উপর মৌরুসী পাট্টা। এই উদ্দেশ্যসাধনে সে দৃষ্টিকোণের মধ্যে খণ্ডীকরণের প্রবৃত্তি জাগায়। প্রয়োজনবাদী উপযোগ আস্তটাকে খণ্ড করে বাদসাদ দিয়ে চাখতে চায়। কাণ্ডলালের কথা মনে পড়ে: "আমাদের বিশুপাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা কেবল পাঠার নিজের পক্ষেই দরকার। যারা তাকে খায় তারা হাড়-গোড় ক্ষুর-লেজ বাদ দিয়েই খায়।"[১] খণ্ড করে দেখা উপযোগের প্রকৃতি, কারণ খণ্ডীকরণের সঙ্গে সংকীর্ণতার যোগসাজশ আছে। খণ্ড যখন বলতে পারে 'আমিই আস্ত আমিই গোটা' তখন তার পক্ষে সমগ্রকে বাদ দিয়ে আপন মহিমা প্রচার করা সহজসাধ্য হয়। এই প্রচারের বলি অবশ্যই মানুষের মন। বহুধা বিভক্ত হয়ে তার আসল পরিচয় তার সমগ্রতা ভুলে যায়; নিজেকে খণ্ড ব'লে শেখে জানে, সমগ্র ব'লে চালায়, হেড অফিসের বড়োবাবুর মতো বলে, 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।'

দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডীকরণের সঙ্গে সংকীর্ণতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যেখানে প্রথমটি, সেখানেই দ্বিতীয়টি। সঙ্গে সঙ্গে লোভের ভেলকি। লোভকে বাড়িয়ে দেওয়াতেই উপযোগের লাভ। বিপণিক ব্যবস্থায় **consumptionist motivation** একটা প্রধান অবলম্বন। ঢালাও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভোগ্যবস্তুর চাহিদা হিস্টিরিয়ার মতো ছড়িয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ যাকে নাম দিয়েছেন **'the spirit of the Shop'** সেটা ভোগবাদের উপদেবতা। এই উপদেবতাটিকে অফুরন্ত ঐহিক চাওয়া দিয়ে পূজা করতে হয়। এটা চাই সেটা চাই। 'বহু-ইচ্ছা'কে সংকট বলবে কে। টুকরো জিনিস দিয়ে ঘর ভরি, বলি 'সাজাই'। জিনিসের যত প্রাচুর্য যত জলুস যত দাম ততই সমাজস্বর্গে ওঠার সিঁড়ি আয়ত্তাধীন। এই

১. রক্তকরবী, পৃ. ২২

যেখানকার আবহাওয়া যেখানে 'ধন-প্রলোভন-নাশন-বিত্ত'-এর ধারণা একেবারেই দুর্বোধ্য— সেটা আবার কেমন ধরনের বিত্ত, আওয়াজ নেই জলুস নেই। যে বিত্ত সহজবোধ্য, তাকেই চাই। চাওয়ার অবাধ প্রসার। কেউ যদি বলে 'বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে', সে পাগল ছাড়া কিছু নয়। আরামবিহীন জীবনযাপন উপহাস্য। 'ক্ষত-চিহ্ন অলংকার' অবাঞ্ছনীয়। মানুষ নিজেই নিজেকে কোথায় নিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন: **"With his cult of power and his idolatry of money he has, in a great measure, reverted to his primitive barbarism, a barbarism whose path is lit up by the lurid light of intellect.··· It may be bewildering in its surface adornments and complexities, but it lacks the ideal to impart to it the depth of moral responsibility."**[১] বর্বরতার বিগ্রহ কুবের। ঈর্ষা-জাগানো চাকচিক্য তার ধ্বজদণ্ড। সেখানে পথ-দেখানো আলো আসে লুব্ধ বুদ্ধির সূর্পণখী কটাক্ষ-বিদ্যুৎ হতে। কিন্তু অন্তর শূন্য। দেবতা নেই। স্বচ্ছ দৃষ্টি নেই। নৈতিক দায়িত্ববোধ নেই। নেই মানুষের প্রতি মানুষের টান। ভোগবাদী প্রেষণার অন্তিম পরিণাম।

লোভের স্বভাব এই যে, যা-কিছু সে স্পর্শ করে সেটাই অসুন্দর অশিব হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাই উপযোগের সিদ্ধিদাতা ক্ষমতার দম্ভ। তার নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি হল সিদ্ধি। স্বার্থসিদ্ধি তার কাছে নৈতিক মানদণ্ড। যে যজমানী সভ্যতায় এটাই একমেবাদ্বিতীয় লক্ষ্য বলে স্বীকৃত সেখানে লোকেরা ওটাকে অন্তরের সামগ্রী করে নিতে শেখে, পরে ওটাই ব্যক্তিক লক্ষ্য হয়ে বাহিরে বিভাসিত হয়। স্বার্থসিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে ধর্মাধর্মের বিচার নেই। সিদ্ধির নামাবলী গায়ে চাপালেই হল। ফলে, উপযোগের নীতিশাস্ত্র যে ভাবমূর্তিটিকে শেষ পর্যন্ত আমল দিতে বাধ্য হয় সেটা, **Michael Polanyi**র ভাষায়, **'the personal immoralism'**। এটাই উপযোগ-সিদ্ধিশাস্ত্রের প্রকৃতি। এটা কিন্তু আত্মবিরোধী, কেননা বিমুখ অস্ত্র অস্ত্রীকেই আঘাত করে। ব্যক্তিক নীতিহীনতা

---

১. "The Modern Age", *Creative Unity*, p. 121

আজ সর্বত্র দৃশ্যমান। সমাজের যৌন সমর্থনে পরিপুষ্ট সমাজবন্ধনেরই গোড়া কাটছে। মানবাত্মিক আদর্শের নীতিবিধান স্বার্থসিদ্ধির যূপকাষ্ঠে নিহত। **Ends** এবং **Means**-এর আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন। মানবকেন্দ্রিক ধর্মনীতির সঙ্গে স্বার্থকেন্দ্রিক সিদ্ধিনীতির প্রভেদ রবীন্দ্রচিন্তায় প্রস্ফুট : "ধর্মের পক্ষে ধৈর্য চাই, আত্মসংবরণ চাই ; সিদ্ধির পথে চাতুরীর ধৈর্য নেই সংযম নেই, তার হস্তপদ চালনা যতই দ্রুত হবে ততই তার ভেলকি বিস্ময়কর হয়ে উঠবে··· ।"[১] আধুনিক যুগ **age of speed** ব'লে আখ্যাত। মর্মার্থে অক্ষরে অক্ষরে সত্য :

"···কাল নাই
আমাদের হাতে ; কাড়াকাড়ি করে তাই
সবে মিলি ; দেরি কারো নাহি সহে কভু ॥"

কাড়াকাড়ির হাটে বিলম্বিত লয় একেবারেই অকেজো।

স্বার্থকেন্দ্রিকতা বেদখলকার। আত্মাকে হটিয়ে 'আমি' রাজা হয়ে বসে। **Individual possessivism**-এর কোলাহল! 'আমার' সার্বভৌমত্ব বেপরোয়া। স্বাধিকারের নীচে অপরের অধিকার। আপন কর্তব্যের উপরে অপরের কর্তব্য। স্বকল্যাণেই পরকল্যাণ। তাই চারি দিকে শোনা যায় : আমার গোষ্ঠীর স্বার্থে, আমার জাতির স্বার্থে আমার দেশের স্বার্থে। অবশ্য একটু রকমফের আছে। গৌরবে বহুবচন। তাই 'আমার' জায়গায় উদয় হয় 'আমাদের'। এখানে গৌরব স্বভাবতই মুখোশ। আমি তার মজ্জায়। আমি কিভাবে আমরা হয়ে ওঠে তার ধরনধারণের আভাস পাওয়া যায় **Jeremy Boissevain**-এর কাছ থেকে : **"Naked motives of crude self-interest can never be brought forward to justify action to others. Pragmatic action is dressed up in normative clothes to make it acceptable."**[২] রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এটাই **'the idealising of organised selfishness'**। সর্বগত-আমির ভেকধারী স্বার্থগত-আমির রাজ্যে নির্বিকল্প মানবাত্মার নিঃসংশয় আদর্শ হয়ে ওঠে

১. যাত্রী, র-র ১৯, পৃ. ৪৪৩

২. ***Friends of Friends* : *Networks, Manipulators and Coalitions* ; Basil Blackwell, Oxford, 1974, p. 6**

ভাববিলাসিতার অস্বাস্থ্যকর জলো হাওয়া। এই হাওয়ার প্রতিষেধক হিসাবে পরমার্থের ব্যাখ্যা করা হয় সর্বজনীন স্বার্থের ভাষ্যে। সর্বজনীন স্বার্থ: এই শব্দযুগল সোনার পাথরবাটির মতো অন্তর্বিরোধী, সুতরাং তাৎপর্যহীন। স্বার্থের দুন্দুভি যেখানে নিনাদিত, সেখানে স্বদেশের চিন্তায় স্বার্থের প্রেষণা অপরিহার্য। স্বাদেশিক স্বার্থ ক্রমশ অতি-সকারী ধর্মের পর্যায়ে উঠে যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: **'some semblance of religion, such as nation-worship।'** এই ধর্ম যখন গোঁড়ামিতে পৌঁছয় (ইতিহাস তার সাক্ষ্য) শেষ পর্যন্ত সে মহিষাসুরের জঙ্গী রূপে মানবতাকে হনন করতে উদ্যত হয়। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন জাপানি সভ্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "জাপানি সভ্যতার সৌধ এক-মহলা —সেই হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার মন্দিরে সব চেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্মনির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে; নীটঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সবচেয়ে সমাদৃত।"[১] সিদ্ধিমঙ্গলের কথা সর্বক্ষেত্রে (বিশেষ করে স্বদেশের ক্ষেত্রে) স্বার্থনীতির কাছে অমৃতসমান।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন দেশাত্মার তুলনায় মানবাত্মা বড়ো। কিংবা বলা উচিত, তাঁর মতে দেশাত্মার পরিচয় মানবাত্মার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে যথার্থ সার্থক হয়ে ওঠে। কারণ দেশ তো ভূখণ্ডমাত্র নয়, দেশ মানুষকে নিয়েই। মানুষের দিকে মানুষের টান এই তো হল পরমাত্মীয় মানবাত্মার বাণী, দেশাত্মা এবং মানবাত্মার ঐকতান। এরই ভিত্তিতে বলা যায় দেশাত্মবোধ ও দেশাভিমান অন্তঃকরণে আলাদা। প্রথমটি মানুষকে নিয়ে। দ্বিতীয়টি ভূখণ্ডকে নিয়ে। প্রথমটির দৃষ্টি দুঃখী-দুঃস্থ-অনুন্নত-উপেক্ষিতের উপর। 'সমাজের যে গভীরতলায় পল্লী তলিয়ে আছে' সেখানে সখ্য-সহায়তার হাত বাড়ানো তার স্বধর্ম। নিষ্পিষ্ট দুর্বলের অন্তরে আত্মশক্তি সঞ্চার করা তার স্বভাব। মানুষের মাঝে তফাত-করা বেড়া ভেঙে-দেওয়াই তার আনন্দ-যজ্ঞ। এই দুঃসাধ্য আদর্শের সাধনা যে কত কঠিন তা রবীন্দ্রনাথের অনুগামী উদ্‌ধৃতি হতে স্পষ্ট বোঝা যায়: "বোলপুরের বাজারে একটা দোকানে যখন আগুন লাগিয়াছিল তখন তোমাদের মনে আছে,

---

১. জাপান-যাত্রী, র-র ১৯, পৃ. ৩৫৮

আগুন নিবাইবার কাজে চারজন বিদেশী কাবুলি তোমাদের সাহায্য করিয়াছে; পাড়ার লোককে ডাকিয়া সাড়া পাও নাই। মনে আছে, যাহাদের নিকট কলসী চাহিতে গিয়াছিলে তাহারা, পাছে তাহাদের কলস অপবিত্র হইয়া নষ্ট হয়, এজন্য দিতে চাহিল না।"[১] দেশাত্মবোধের কাছে বিচ্ছিন্নতা পাপ, সেবাদুঃখ চরম মূল্য। সে বিশ্বাস করে দেশের মানুষকে যদি কোনো মূল্য না দেওয়া হয় তবে দেশের মানুষকে পাওয়া যাবে কি করে। সে ধৈর্যকে স্বীকার করে, ধৈর্য তার কাছে মানবাত্মার রাজপথ, বনপর্বত-লঙ্ঘনকরা রাজপথ। সে বীর্যকে স্বীকার করে, কারণ বীর্য মানবাত্মার পতাকাবাহী জয়রথ। এই বীর্যের দ্বারাই "দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন, মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।"[২]

কিন্তু দেশাভিমান সিদ্ধিমন্ত্রে দীক্ষিত। ধৈর্যে তার আস্থা নেই। আস্থা নেই আত্মধর্মে, সেবা-সহানুভূতি-প্রেমের অব্যাজমনোহর মূর্তিতে। বীর্যের অর্থ তার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে জানে মানুষ খণ্ডমাত্র, ব্যবহার্য, **means to an end**, প্রয়োজনশেষে মৃৎপাত্রের মতো পরিত্যাজ্য। তার লক্ষ্য ছলে বলে কৌশলে ত্বরান্বিত সিদ্ধিলাভ। এটা স্বভাবহন্তা স্বধর্মঘ্ন আত্মা-হন্তারক প্রবৃত্তি। দেশে দেশে এই দেশাভিমানের জয়জয়কার। ক্ষুব্ধ অতীন্দ্রের মুখে তাই শোনা যায়: "দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশানালিস্ট আজকাল পাশব গর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে ···।" বাজারে যা বিকোয় তা এই মিথ্যে ন্যাশানালিজম। মিথ্যার দুরপনেয় প্রভাবে পড়ে ন্যাশানালিজম আজ এমন জায়গায় এসে পড়েছে যেখানে তার আসন টেরিটোরিয়ালিজমের পঙ্‌ক্তিতে। সেটা আত্মার বিচরণ-ক্ষেত্র নয়। এ যুগে টেরিটোরিয়ালিজম বলতে বোঝায় মুলুক-মোহ বা অঞ্চল-আসক্তি— ন্যাশানালিজমের প্রতিশব্দ। প্রগতিশীল চিন্তায় এটা মানববিরোধী ব্যাধি। এই ব্যাধি ভয়ংকর কেননা অতি-সংক্রামক। তাই প্রয়োজন পড়েছে ***World Perspectives***-এর।

---

১. যাত্রার পূর্বপত্র, 'পথের সঞ্চয়', র-র ২৬, পৃ. ৪৬৪
২. তদেব, পৃ. ৪৭৯

বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য "...to clear the way for the foundation of a genuine *world* history not in terms of nation or race or culture but in terms of man in relation to God, to himself, his fellow man and the universe, that reach beyond immediate self-interest."[১] কবি-ভাবনার নির্বিকল্প প্রতিধ্বনি! এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আজ কত গভীর হয়ে উঠেছে তা উপলব্ধি করা যায় যখন চোখে পড়ে মুলুকমোহের দাপটে মানুষের উদার মঙ্গলকামনা কেমন কণ্ঠহারা হয়ে গেছে। মানবাত্মা আজ অচ্ছুত অবমানিত উৎপীড়িত। অতীন্দ্র এই উৎপীড়িত মানবাত্মার প্রতিকায়।

বর্তমানে দেখা যায় উৎপীড়নের বীভৎস আসুরী রূপ। এক নির্বিলীয়মান 'বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত' জনমানস বিশ্ব জুড়ে প্রকাশমান। মানবপ্রেমিক তাকে নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত। হিংস্রতা মানবমূল্যবোধের ছদ্মবেশ পরেছে। Waclaw (Singer-রচিত The Slave উপন্যাসের একটি চরিত্র) বলেছিল: 'Whoever has a sword wants to live by it.' তিনশো বছর পূর্বে সাবেকী সমাজে কেন এটার রেওয়াজ ছিল তা বোঝা সহজ। কিন্তু এটাই বোঝা সহজ নয় যে কেমন করে এই সমাপ্তপ্রায় বিজ্ঞান-বিভাসিত বিংশ শতাব্দীতে ত্রাসের পেশা এত 'জনপ্রিয়' হয়ে উঠেছে: ছোরা-বন্দুক-বোমার আস্ফালনে শান্তি হৃতচেতন। নিষ্করুণ ছোরার মুখে জীবনের স্বর্গীয় মূল্য নিমেষেই রক্তপ্লুত। এই পরিপ্রেক্ষিতে Erich Fromm-এর সময়োচিত সাবধানোক্তি বিবেচনার বিষয়: "The situation of mankind today is too serious to permit us to listen to the demagogues— least of all demagogues who are attracted to destuction— or even to the leaders who use only their brains and whose hearts have hardened. Critical and radical thought will only bear fruit when it is blended with the most precious quality man is endowed with— the love of life."[২]

১. *World Perspectives* এক প্রগতিশীল গ্রন্থমালার অভিধা। প্রকাশক: George Allen & Unwin।

২. *The Anatomy of Human Destructiveness*, Penguin Books, London, 1977, p. 579

মানবাত্মিক আদর্শের মূল কথা হল জীবনপ্রেম— তাকে মানুষের পরমধন ব'লে মর্যাদা দেওয়া, ত্রাসের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা। কিন্তু অবিশ্বাসীরাই প্রবল। তাদের মুখে ধ্বংসের কথা, প্রেমের কথা নয়। সমস্যা এই যে, তাদের রুখতে না পারলে তো জীবনপ্রেম অর্থহারা ব্যর্থ।

চার অধ্যায়ের মর্মকথায় এই প্রশ্ন। জীবনপ্রেম ও তার রাহুগ্রস্ত পরিসমাপ্তি কাহিনীর উপজীব্য। জীবনপ্রেমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। অতীন্দ্রের আদর্শ এই দুটি পরস্পরাশ্রয়ী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব এবং বৈচিত্র্যের প্রকাশ প্রেমে যেখানে পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণ করে। যারা এই সত্যকে ভ্রান্ত বলে ভাবে তারা মনে করে আপন শক্তির উপর বিশ্বাস ঘুচিয়ে দেওয়া আদর্শের প্রধান কাজ। প্রেম যে পূর্ণ প্রাণের প্রতিশ্রুতি, তাদের কাছে সে কথার কোনো মূল্যই নেই। এই উপযোগ-নীতি যাদের চিন্তাধারাকে চালায়, অতীন্দ্রের কাছে তারা 'মন্ত্রদাতা' 'সর্দার' 'নাচনওয়ালা', Fromm-এর কাছে কুলিশকঠোর demagogues ও leaders। তারা 'বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো'। কারণ তারা জীবনবিমুখ ব্যক্তিত্ববিদ্বেষী ধ্বংসপ্রাণ। তাদের মুখে জীবন-ঋদ্ধির কথা আত্মপ্রবঞ্চনার ফেনিল বুদ্‌বুদ। প্রগতিশীল চিন্তাধারা যাকে নিয়ে উদ্‌বিগ্ন, সে মানবাত্মা। সে আত্মপ্রবঞ্চনার কর্তা হতে পারে না। তার জীবনের গান অনন্ত প্রেম, মন-মিলানো আত্মীয়তা। মানবাত্মার পরিচয় পেষণে নয় শোষণে নয় বিচ্ছিন্নতায় নয় প্রবঞ্চনায় নয়। 'মর্ত্য-কাছে স্বর্গ যা চায় সেই মাধুরী'-র উন্মীলনে তার স্বীকারসাধন। চার অধ্যায়ের মানবিক পরিচয় এইখানেই।

মানবাত্মা বিশ্বজনীন। চার অধ্যায়ের ভাবকল্পও বিশ্বজনীন। এই বিশ্বজনীন পরিচয়ের আবরণ উন্মোচনের জন্য এমন একটি পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন যার প্রযোজ্যতাও বিশ্বজনীন। আজকের অত্যুন্নত দেশের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় এক লোভ-জটিল শোষণ-লিপ্ত শাসনোদ্ধত 'অনলনিশ্বাসী' পরিবেশ! মহাজনী সভ্যতায় স্বার্থসিদ্ধির উপযোগবিধান এমনভাবে যুগমানসে অনুপ্রবেশ করেছে যে তার বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্যপ্রায় প্রয়াস বলে মনে হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রেও মহাজনী প্রভাব দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। সুতরাং বলা যায় সারা বিশ্বে স্বার্থসিদ্ধির উপযোগবিধানের 'অভ্রভেদী আত্মঘোষণার' অট্টহাস্যে বিপ্রলব্ধ মানবাত্মা হতাশ্বাস অসুস্থ রক্তহীন, অস্তিত্বের অসত্তায় নিস্তেজ।

তার কণ্ঠ কোথায় যে সে প্রার্থনা করবে অসতো মা সদ্গময় ; তার শক্তি কোথায় যে Essence-এর প্রকাশ-সাধনায় ব্রতী হবে। সত্তাধিগমের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে ভ্রূকুটি কুটিল, অতীন্দ্রের ভাষায়, 'বড়ো নামওয়ালা বড়ো ছায়াওয়ালা বিকৃতি'। সেইজন্য এ কথা মানতে হবে যে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা আজ বিশ্বজনীন। চার অধ্যায়ের মূল্যায়ন সেই পরিপ্রেক্ষিতেই করা সমীচীন বলে বোধ হয়। তাই বর্তমান মূল্যায়ন-প্রয়াস প্রতীচীর দৃষ্টিকোণ দ্বারা প্রভাবিত। প্রসঙ্গসম্মত ঐ চিন্তাধারা হতে দৃষ্টান্ত / উদ্ধৃতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

আর-এক দিক থেকেও পশ্চিমী পরিপ্রেক্ষিত এই সাহিত্যসৃষ্টির মূল্যায়নে সাহায্য করবে আশা করা যায়। এটা Outsider-এর ধীকল্প। প্রতীচীর সাহিত্যে তার সাক্ষাৎ পেয়েছেন Colin Wilson। অতীন্দ্র কি একজন outsider ?

কাকে outsider বলা হবে? পরবাসী। পুরবাসীর মধ্যে পরবাসী। সে কি অগণিত অন্তরে-অন্ধ খণ্ড-প্রাণের মধ্যে লক্ষ্যলব্ধ পূর্ণ-প্রাণ? সে কি পাথর-ছড়ানো পথে শতলক্ষ লক্ষ্যভ্রষ্টের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত ক্লান্তচরণ লক্ষ্যনিষ্ঠ? এরা অবশ্যই আত্মকর্তৃত্বের অধিকারী। বাহিরের বাধাকে উপেক্ষা করবার মতো শক্তি রাখে এরা। যেখানে আত্মশক্তির নাম জানে না কেউ, এরা সেখানে পরবাসী বৈকি। অন্যদিকে— সে কি বাস্তবের বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত অস্তিত্বের মধ্যে দিশাহারা পরমার্থসন্ধানী? সে কি নৈতিক দায়িত্ববোধহীন পরিবেশে আপস-অনাপসের দ্বন্দ্বে উদ্‌ভ্রান্ত আদর্শপ্রাণ উদ্যমী? এরা আত্মিক অরাজকতার বলি। কিংবা বলা যেতে পারে, বাহিরের বিশৃঙ্খলা ভিতরে প্রতিবিম্বিত— অন্তরে বিস্রস্ত। নিজেকে বহুধা করে ফেলেছে। তার মধ্যে সমন্বয়ী সত্য নিখোঁজ। প্রকৃতপক্ষে সমন্বয়ী সত্য বলে কি কিছু আছে? সত্তা বা Essence বলতে কি বোঝায়? Existence বা অস্তিত্বের সবটাই ছলনা প্রবঞ্চনা অবভাসমাত্র নয় কি? "তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিক্‌হারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।"[১] নিজের-কাছে-হারানো মানুষের অন্তঃকরণে জাগে, Logotherapyর প্রবর্তক Victor E. Frankl যাকে আখ্যা দিয়েছেন,

১. রক্তকরবী. পৃ. ৪১

existential frustration। অস্তিত্বের ব্যর্থতাবোধ নানারকম মনোবিকারের উৎস। এই মনোবিকারগুলি Collective Neuroses of the Present Day ব'লে সূচিত। সমকালীন সমষ্টিগত উদ্বায়ুর শিকড় অন্তস্তলের গভীরে, বিস্তার বিশ্বজোড়া। Frankl বলেছেন: "Deep down, in my opinion, man is dominated neither by the will to pleasure nor by the will to power, but by what I call the will to meaning: his deep-seated striving and struggling for a higher and ultimate meaning to his existence. This will to meaning can be frustrated. I call this condition existential frustration and oppose it to the sexual frustration which has so often been incriminated as an astiology of neuroses."[১] জীবনের অর্থ কী এই অন্তরতম জিজ্ঞাসাই মানুষের চিরন্তন তৃষ্ণা। তৃষ্ণার জল পাওয়া যাবে উত্তর থেকে। তৃষ্ণানিবারণী 'জীবনের স্বর্গীয় অমৃত' যখন জড়ের কবলে পড়ে জমাট বেঁধে যায় তখন অস্তিত্বের ব্যর্থতাবোধ ভিতরটাকে কুরে কুরে ঝাঁজরা করে দেয়। 'হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার'। অর্থহীনতা শূন্যতা ক্ষণিকতা অবভাস চারি দিক হতে তাকে চেপে ধরে। *Nausea*-র উৎস এটাই। অতীন্দ্রও এই শুক্কারব্যাধির শিকার। কিন্তু অতীন্দ্রের যন্ত্রণা আরো মর্মন্তুদ। Frankl-এর মতোই তার বিশ্বাস ছিল: "We have not only the possibility of giving a new meaning to our life by creative acts and beyond that by the experience of Truth, Beauty, and Kindness, of Nature, culture and human beings in their uniqueness and individuality, and of love ··"[২] এই বিশ্বাস এত ধ্রুব যে তার অম্রিয়মাণ আলোয় সে দেখতে পেল বাস্তবতার বিশৃঙ্খল বীভৎস রূপ, যে রূপকে সে বাহিরে স্বীকার করে নিয়েছে, যার সঙ্গে তার অহর্নিশি রক্তস্রাবী দ্বন্দ্ব। কিন্তু সেই বাস্তবতার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। কারণ, সত্যতার প্রকাশ

---

১. *Psychotherapy and Existentialism,* Penguine Books, London, 1973. pp. 117-18

২. *ibid,* p. 128

সেখানেই যেখানে আছে শৃঙ্খলার সৌন্দর্য মাধুর্যের দান, আছে শান্তি শ্রী কল্যাণ শুভানুধ্যান। সে সজ্ঞানে জানে জীবনটা জালিয়াৎ, বর্তমান ছোটো মুখে বড়ো কথা বলে। মরীচিকার বাসরঘর, চরমে-না-পৌঁছনো দিনগুলির ছায়ামূর্তি— তার কাছে এগুলোই সত্য। ধুলায় তাদের যত অবহেলাই হোক-না কেন, সত্যের পদপরশে তারা পুণ্য। অতীন্দ্র যদি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হত যদি তার বিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে দিতে পারত নিজেকে অসংকোচে প্রবঞ্চিত করত তা হলে আর-সকলের মতো 'সরকারী পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি' হত। কিন্তু তা যে হবার নয়। তার স্বাতন্ত্র্যধর্মী জীবন-বিশ্বাসকে কেমন করে ঝেঁটিয়ে ফেলে দেবে পাঁশতলায়? পারল না বলেই তার মুখে শোনা যায়: "নব যুগ, নব জন্ম, মৃত্যুর তোরণ প্রভৃতি ওদের বাঁধা বুলিগুলো শুনলে আমার লজ্জা করে। ওরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে আমার মনের উপর ওদের দলের তুলি বুলোতে— কিছুতেই রঙ ধরল না।" ফলে পুরবাসী হয়েও অতীন্দ্র পরবাসী। আধুনিক ব্যবস্থাপনা-তত্ত্বের ভাষায় সে *Organisation Man* হতে পারল না; কিছুতেই 'sense of belonging' জাগল না। তার ভবনে-ভুবনে আধা-আধি রয়ে গেল।

বিশ্বসাহিত্যে একাধিক শ্রেণীর পরবাসী দেখা যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রেণী থেকে তিনটিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ বেছে নেওয়া যেতে পারে। তারা: Hesse-এর *Siddhartha*, Rolland-র *Jean Christophe* এবং রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্র। প্রথম মানুষটি আত্মোপলব্ধির প্রশান্তিময় চিত্র: বিভিন্ন পথ-পরিক্রমণোত্তর মুক্তিস্নাত জীবনবিজয়ী আলোর যাত্রী। দ্বিতীয়টি ঝড়ো-হাওয়ায়-বিধ্বস্ত কিন্তু লক্ষ্যনিষ্ঠের চিত্র: জীবনপ্রেমের উদ্‌গাতা সুরলক্ষ্মীর সাধক— দূরের খেলায় সুরের খেলায় তার নিমন্ত্রণ, গহন জটিল ঘনপঙ্কিল বঙ্কিম দুর্গম পথে দুঃসাহসিক চলনে ক্লান্ত কিন্তু সংকটবিজয়ী অন্তর শান্ত, পরম লগ্নের জন্য প্রতীক্ষারত, একটি মাত্র আশা নব অরুণোদয়ে জীবনমৃত্যুর মহামিলনের ঐকতানে অংশী হবে। তৃতীয় মানুষটি নিশানাহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিন্নভিন্ন অস্তিত্বের চিত্র: জীবনবিজিত আঁধারের যাত্রী, শুধু একটিমাত্র আশা মৃত্যুর স্নিগ্ধ সুগভীর শান্তির মাঝে যেন অনন্তের ক্ষমা পায়। তিনটি চিত্রের মাঝে কিন্তু একটা মিলনসূত্র আছে: আত্মপ্রবঞ্চনামুক্ত সুকঠিন অন্তঃসমীক্ষা— authenticityর সুস্পষ্ট প্রকাশ।

চার অধ্যায়ে ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের ভিতর দিয়ে কবি শক্তিতত্ত্বের একটি সুসম অভিনব ব্যাখ্যার আভাস দিয়েছেন। শক্তিতত্ত্বের প্রথিতযশা প্রবক্তা নীট্‌শে। ইন্দ্রনাথ নীট্‌শের ভাবশিষ্য। তাই ইন্দ্রনাথ-চরিত্র নীট্‌শের শক্তিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্লেষ্য ও বিচার্য। নীট্‌শের জীবনবাদ দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে যে দৃষ্টিকোণ দিয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছিল, যুদ্ধোত্তর ব্যাখ্যা ও নবমূল্যায়ন সেটা থেকে ভিন্নধর্মী। বর্তমান গ্রন্থে ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের বিশ্লেষণ নবমূল্যায়নাশ্রয়ী। জনান্তিকে বলা যায়, এটা খুবই বিস্ময়কর লাগে যে, রবীন্দ্র-সূচিত শক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা অনেকাংশে আধুনিক নবমূল্যায়নের পূর্বাভাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে, নীট্‌শে-কল্পিত superman তাঁর তত্ত্বের মধ্যমণি। এই superman শব্দটি যত গোলযোগের মূল। যে জার্মান শব্দটি নীট্‌শে ব্যবহার করেছেন তার প্রচলিত ইংরেজী পরিভাষা superman। কিন্তু Walter Kaufmann দেখিয়েছেন যে superman শব্দটি নীট্‌শে-প্রযুক্ত জার্মান শব্দটির ভাবার্থ প্রকাশ করে না এবং সেই কারণে এটা বিভ্রান্তিকর। তিনি লিখেছেন : "Of course, Nietzsche later gave the term a new meaning— but one easily overlooks the connotation the word had for him and the English 'superman' is misleading."[১] তিনি superman শব্দটির পরিবর্তে overman শব্দটি যুক্তিযুক্ততাসহকারে ব্যবহার করেছেন : " 'Man is something that should be overcome'— and the man who has overcome himself has become an overman."[২]

Superman-এর প্রচলিত বাংলা পরিভাষা 'অতিমানব', কোথাও কোথাও 'মহামানব'। এই প্রসঙ্গে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে (হুমায়ুন কবির -সম্পাদিত, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ -কর্তৃক প্রকাশিত) ডঃ শিশির-কুমার মিত্র -রচিত 'শোপেনহাউয়ের ও নীটশে' নামক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। 'অতি' উপসর্গটি অতি-উদার। যে-কোনো শব্দের সঙ্গী হতে সে সর্বদাই উন্মুখ। কিন্তু

---

১. *Nietzsche : Philosopher, Psychologist, Antichrist*, Princeton University Press, 1974, p. 308

২. *ibid*, p. 309

গোল এই নিয়ে যে, উপসর্গটি যে-শব্দের সঙ্গী হয় তার অর্থে ধোঁয়াটে-ব্যাধির উপসর্গ দেখা দেয়। অতিমানবের অর্থ হতে পারে অতিকায়, অতিবুদ্ধিমান, অতিশক্তিমান অতিভাবপ্রবণ এমন অনেক কিছু; অনেক অর্থের জটপাকানো বিভ্রান্তিকর প্রয়োগ। জট-ছাড়ানো অতি-কঠিন কাজ হয়ে ওঠে। 'মহামানব' শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপযুক্ত প্রক্ষেপেই তার প্রয়োগ বিধেয়। যখন কবি লিখেছিলেন 'ওই মহামানব আসে' তখন তাঁর মনে একটা নির্দিষ্ট ভাবকল্প ছিল। সেই ভাবকল্পের অনুসরণে বলা যেতে পারে যে তিনিই মহামানব যাঁর সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি 'শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য'।

এ দুটি পরিভাষার মধ্যে একটিকেও বিশেষ অর্থদ্যোতক বলে মনে হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে Kaufmann-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ overman-এর অনুসরণে 'ক্রান্তপুরুষ' ব্যবহার করা যেতে পারে। এটাই প্রকৃত ভাবার্থকে প্রকাশ করতে পারবে বলে মনে হয়। যে নিজেকে অতিক্রম করতে পেরেছে সে-ই ক্রান্তপুরুষ।

বর্তমান রচনাটির বিষয়বস্তু "রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়" নামে 'সমকালীন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কাল: চৈত্র ১৩৭১ থেকে আশ্বিন ১৩৭২ পর্যন্ত। গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য সংশোধন সংযোজন পরিবর্তন পরিশোধনের প্রয়োজন পড়েছে।

রচনার কাজে লেখক প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে অনেকের কাছে ঋণী। প্রথমেই মনে পড়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বর্গত সুভাষ সেনের কথা। ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত রচনাটির পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠক ছিলেন তিনি। তাঁর অকৃপণ ও ঐকান্তিক প্রেরণাই লেখককে সাহিত্যপ্রয়াসে পুনরুদ্যোগী করেছিল। এই উদ্যোগের পিছনে আরো একজনের দান প্রভূত। তিনি লেখকের সহোদরপ্রতিম বন্ধু সুকবি শ্রীআনন্দগোপাল সেনগুপ্ত— 'সমকালীন'-সম্পাদক। অতি কাছের মানুষ অনুজপ্রতিম বন্ধু সমীরণ রায়ের একনিষ্ঠ আগ্রহ রচনা-প্রয়াসে বলিষ্ঠ সহায় ছিল; তাঁর মৃত্যুহীন ভালোবাসায় গ্রন্থটি সঞ্জীবিত। অধ্যাপক শ্রীঅমরচাঁদ দে এবং পুত্রোপম শ্রীঅভীক বোস লেখকের গ্রন্থের চাহিদা পূর্ণ করেছেন উদার প্রসন্ন অন্তরে। সংযোজন-সংশোধন কাজে যাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে আছেন শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির মধ্যে

ছড়িয়ে আছে তাঁর সাহায্যের অজস্র চিহ্ন। তাদের অঙ্গুলিসংকেত লেখককে ভাবিয়েছে খাটিয়েছে পথ দেখিয়েছে। এ ছাড়া তথ্যসংগ্রহের কাজে শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে শ্রীভৌমিক নানা পুঁথিপত্র অধুনা-দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির সন্ধান দিয়ে সরবরাহ করে লেখকের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন। তাঁর ঔদার্য অবিস্মরণীয়। শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর উপর লেখকের দাবির জোর সব চেয়ে বেশি; সহাস্য বদনে সব সয়েছেন এবং হাওয়া-হাত্ড়ে-বেড়ানো লেখকের বরাবর খট্কা-সংকট থেকে ত্রাণ করেছেন। বিশেষ করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়ে লেখককে বাধিত করেছেন। শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসে ব্যাপক জ্ঞান, বিশেষ করে, স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্পর্কীয় ব্যাপারে, অনেক প্রশ্নের সমাধানে সাহায্য করেছে। আর-একজনের কাছে লেখক কৃতজ্ঞচিত্ত— তিনি প্রীতিপরায়ণ শ্রীরণজিৎ রায় যাঁর অশেষ উৎসাহে সহযোগিতায় গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়েছে। বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের কর্তৃপক্ষ লেখকের কাছে অমিত-ধন্যবাদার্হ। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এর একটি পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিচিত্র এবং তৎকালীন কবির একটি আলোকচিত্র দিয়ে গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা পরিপূর্ণ এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছেন। লেখকের অপরিশোধ্য ঋণ তার একান্ত সহৃদয় চার জন ডাক্তার বন্ধুর কাছে যাঁরা লেখককে Lazarus-এর মতো কবর থেকে উদ্ধার করে নূতন জীবন দান করেছেন। তাঁরা: শ্রীদেবপ্রসন্ন বসু, শ্রীকান্তিভূষণ বক্সি, শ্রীঅনিলকুমার দত্ত এবং শ্রীবিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। পরিশেষে রবীন্দ্রদরদী চিন্তানায়কদের উদ্দেশে লেখকের সশ্রদ্ধ নমস্কার। তাঁদের প্রজ্ঞার আলোয় রবীন্দ্রায়ন উজ্জ্বল, পরিক্রমণ সাধ্যায়ত্ত।

শেষ কথা: গ্রন্থে 'চার অধ্যায়' থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অগ্রহায়ণ ১৩৮২ মুদ্রণের কেবলমাত্র পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখ এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণের পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী স্থলে র-র ব্যবহার করা হয়েছে।

৮ অগস্ট ১৯৭৯ শুভব্রত রায়চৌধুরী

পটভূমি

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশক বাংলার তথা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস তাৎপর্যময়। পিটিশান-পন্থা, সন্ত্রাসবাদী অভ্যুত্থান, অহিংস অসহযোগ— এই ত্রিমুখী স্রোতের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বরাজ-সাধনার ক্রমবিকাশ। এদের মধ্যে অহিংস আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সার্থকতা ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে অনেক বেশি সক্রিয় সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাবপ্রবণ বাঙালিমনের দিক থেকে সন্ত্রাসবাদের আবেদন নিবিড়। বস্তুত, সন্ত্রাসবাদের ঐতিহ্য প্রায় এক শতাব্দীর পুরোনো। আনন্দমঠে বর্ণিত সন্তান বিদ্রোহের কথা না-হয় ছেড়েই দেওয়া যাক। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সহিংস অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অগ্নিযুগে। তার প্রায়-শেষ আহুতি চট্টগ্রাম বিপ্লবে। এই দীর্ঘ তিরিশ বছরের সাধনায় যতি পড়েছে বার-কয়েক। কিন্তু যাঁরা শক্তি-সাধনার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা দুরাশার দুঃসাহসে নির্ভীক তেজস্বিতায় অকুণ্ঠ মৃত্যুবরণে আত্মোৎসর্গের মহিমময় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তাঁদের স্মৃতি বাঙালিচিত্তে অমর হয়ে আছে। সন্ত্রাসবাদ সংগত কি অসংগত, সে প্রশ্ন নিঃসন্দেহে বহুবার জেগেছে। তার যথাযথ উত্তরও মিলেছে। কিন্তু মৃত্যু দিয়ে যাঁরা অমরতার গৌরব অর্জন করলেন তাঁদের জন্য বাঙালিমন জ্বালিয়ে রাখল স্নেহের অনির্বাণ শিখা। মা যেমন তাঁর দামাল ছেলের প্রতি স্নেহশীলা প্রশ্রয়দাত্রী হয়ে থাকেন, বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে দুঃসাহসী বিপ্লবীরাও তেমনি এক ভালোবাসার ধন হয়ে উঠেছিলেন। দুর্ধর্ষ ইংরেজ শক্তি— যার রাজ্যে সূর্য নাকি কখনো অস্ত যায় না— তারই সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় নামল মুষ্টিমেয় নবীনের দল। এই হারের খেলায় গৌরব শুধু দুঃসাহসিকতার, মহত্ত্ব শুধু মরবার মতো মরতে পারার। সেই গৌরব এবং মহত্ত্ব বাংলার বুকে বিপ্লবী শহীদদের জন্য এক গভীর মমত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছিল।

১৯৩৪ সাল। বাংলার ঘরে ঘরে তখন চট্টগ্রাম বিপ্লবের বীর্য-গাথা রূপকথার আসন নিয়েছে। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অনিবার্য শূন্য পরিণাম এবং অবিশ্রান্ত দুঃসাহসিকতা জাতিকে যুগপৎ সকরুণ বেদনায় এবং আত্মসচেতন গর্বে উদবুদ্ধ

করে তুলেছিল। এমনি এক ভাবাবেগ-তপ্ত রাজনীতিক আবহাওয়ার মধ্যে আবির্ভূত হল 'চার অধ্যায়'।

সার্থক রচনামাত্রই গভীর সমাজ-চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে। বৈশ্বমানবিক আদর্শ এবং চিরন্তন শ্রেয়োবোধ সেই সমাজ-চেতনার বনিয়াদ। যে-মনীষা হতে সার্থক রচনা উৎসারিত হয়, সে-মনীষা কেবলমাত্র যুগচেতনার প্রতিবিম্ব নয়। যুগচেতনাকে অতিক্রম করেই তার আত্মপ্রকাশ। এই প্রসঙ্গে Lucien Goldmann-এর Hidden God গ্রন্থটির সমালোচনা-কালে Alasdair Mcintyre-এর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "Moreover, the greatest writers both express and transcend their age. They show us the possibilities in the age of going beyond it, whereas lesser writers exhibit the limitations imposed upon them by the age".[১]

সাধারণ মনীষার অভিব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট যুগের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় একটি বিশিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তাই যুগমানসের পক্ষে কালের প্রভাব কাটিয়ে যুগ-জাত অভিজ্ঞতার সীমা-রেখা পেরিয়ে যাওয়া দুরূহ। কিন্তু মানব-সমাজে এমন এমন লোকোত্তর প্রতিভার অভ্যুদয় ঘটে, যাঁদের মনীষা তৃতীয় নয়নের মতো সুদূর-প্রসারী, তলাবগাহী, সর্বখর্বতা-দাহক, সত্য-স্মারক। তাঁদের অনুভাবে ধরা দেয় সর্বকালীন সর্বজনীন কল্যাণশ্রী— তাঁদের রচনায় রূপায়িত হয়ে ওঠে কালাতীত মানুষের শাশ্বত আশা আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাস। এমন প্রতিভার সঙ্গে যুগমানসের সংঘর্ষ ঘটেছে বহুবার। ইতিহাস তার সাক্ষী। কিন্তু পথিকৃৎ প্রতিভার অবিচল সত্যনিষ্ঠা হার মানে নি। আর, হার মানে নি বলেই সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। মানবতার চিরন্তন আদর্শের অনির্বাণ আলোয় সেই প্রতিভার সাহিত্য-সৃষ্টি ভাস্বর হয়ে আছে আজও। অবশ্য এ কথা কেউই অস্বীকার করবে না যে, যুগ-বন্দী মনীষার অদূরদর্শী সমালোচনা মেঘের ছায়া ফেলেছে যুগ-বিপ্লবী চিন্তাধারার উপর। কিন্তু বারে বারে এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সে ছায়া ক্ষণস্থায়ী। পরবর্তীকালে তাই নূতনভাবে মূল্যায়নের

১ *Encounter*, October 1964, p. 72

প্রচেষ্টা এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সৃজনশীল রচনায় মানবিক সার্থকতা নূতনতর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনি করেই এগিয়ে চলে শ্রেয়ঃ-আশ্রয়ী চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ।

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "এ কথা শুনে তুমি হয়তো বিস্মিত হবে। তুমি জানো পোলিটিকাল আন্দোলনে যোগ দেওয়া আমার স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ।... সাধারণত পলিটিক্‌সের উন্মাদনায় বহুল পরিমাণে যে মিথ্যা যে অত্যুক্তি যে দলাদলির বিদ্বেষবিষ উগ্র করে তোলে তার দূষিত সংক্রামকতা থেকে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও ছাত্রীদের মনকে সতর্কভাবে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি।"[১]

রাজনীতিক পরিস্থিতি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কবির পক্ষে সব সময়ে সফল হয় নি। "ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো" নিঃস্পৃহ ঔদাসীন্যে রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পরিহার করে চলতে পারেন নি। ভারতবর্ষে যে নূতন ইতিহাস রচনার সাধনা শুরু হয়েছিল, তার শঙ্খধ্বনি কবির প্রাণেও গভীরভাবে সাড়া জাগিয়েছিল। তাই কবির উদাত্ত আহ্বান: "বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে / মরতে হয় তো মর্ গো।" কিন্তু পোলিটিকাল আবহাওয়ার সঙ্গে সচরাচর শিল্পী-সাহিত্যিক নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের বেলায় এই সত্য সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত। তার একটা বড়ো কারণ: পোলিটিকাল আবহাওয়া দূষিত, মানবতার আদর্শ সেখানে একটা মুখের বুলি, একটা ভানবিলাসিতা মাত্র। ইউরোপের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে কবি মন্তব্য করেছেন: "ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপের বিষয়বুদ্ধি বৈশ্যযুগের অবতারণা করলে। স্বজাতি ও পরজাতির মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করে ধনস্রোত নানা প্রণালী দিয়ে য়ুরোপের নবোদ্ভূত ধনিকমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বত্র সর্ব্ববিভাগেই ভেদবুদ্ধি, তা ঈর্ষাপরায়ণ।"[২] এই ভেদবুদ্ধি ও ঈর্ষা, এই শোষণ-প্রবণতা, এই আত্মনিমগ্ন ভোগবিলাস— এরা শুধু রাজনীতির মধ্যে এক "বৈনাশিক শক্তি" সঞ্চার করেই ক্ষান্ত হয় নি, পুরো মানব-সভ্যতাকেও বৈশ্যবৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন করেছে। আজকের বণিক সভ্যতার

---

১. চিঠিপত্র ১১, পৃ. ১৮৭-৮৮

২. তদেব, পৃ. ১৩৩

তারস্বর : আরো চাই, আরো চাই। নগ্ন এই চাওয়ার রূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানব-সভ্যতার আর-একটা দিকও দেখতে পেয়েছিলেন : "সভ্যতার এই ভিত্তি-বদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংসজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচব নইলে চোখরাঙানীর ভান করে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্ব্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবে না।"[১] এটাই তাঁর বিশ্বাসকে সজীব করে তুলেছিল : "নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখি নি।"[২]

এই ব্যক্তি-বিতৃষ্ণ রাজনীতি, এই শোষণ-প্রবণ রাষ্ট্র ও সমাজ -ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা হয়েছে মানবিক আদর্শের মানদণ্ডে। কবি দেখেছেন : একটা অদ্ভুত দুর্ভেদ্য নিরুপায়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত মানুষ যেন পুতুল বনে গেছে : "...দুর্ব্বলের প্রতি নির্ম্মম সভ্যতার ভিত্তি বদল না হলে ধনীর ভোজের টেবিল থেকে উপেক্ষায় নিক্ষিপ্ত রুটির টুকরো নিয়ে আমরা বাঁচব না।"[৩] কবির লড়াই বৈশ্যযুগের "লোভী মনিবের" সঙ্গে। মানুষ আর্তকণ্ঠে বলছে : "বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।" সেই ডাক কবি অহোরাত্র শুনেছেন, ব্যথা পেয়েছেন আর নিরুপায়তার সামনে দাঁড়িয়ে অন্তরে জ্বলেছেন।

কবি যে মানদণ্ডে সমাজব্যবস্থাকে রাষ্ট্রতন্ত্রকে বিচার করেছিলেন, সেই মান-দণ্ডেই আমাদের মুক্তি-আন্দোলনের বিভিন্ন ধারারও মূল্যায়ন করেছেন। এই মানদণ্ডের কাছে সব চেয়ে বড়ো কথা হল : মানবধর্ম। স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে যখন দেখতেন অমানবিক অতিশয়তা, তখন তিনি পীড়িত ক্ষুব্ধ হতেন, কলমের মাধ্যমে সেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। চার অধ্যায় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১, চিঠিপত্র ১১, পৃ, ১৪৫

২. তদেব, পৃ, ১৪৫-৪৬

৩, তদেব, পৃ, ১৪৫

রবীন্দ্রমানসের মর্মকথা হল: আত্মশক্তি। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার আত্মশক্তিতে। এই আত্মশক্তির সন্ধানে কবি জীবন-প্রভাতেই স্বপ্ন-ভাঙা নির্ঝরের মতো যাত্রা শুরু করেছিলেন মহামানবের সাগর-তীর অভিমুখে। আত্মশক্তির উপর অটল বিশ্বাস তাঁর সাহিত্যকীর্তির দীপ্তি, তাঁর শ্রেয়োবোধের ধুয়া, জীবনমূল্যায়নের মানদণ্ড। কবির কাছে আত্মশক্তি এবং মনুষ্যত্ব সমার্থক। যেখানে মনুষ্যত্বের অনাদর, সেখানে আত্মশক্তি অবদেমিত অবহেলিত। তাই, মনুষ্যত্বের অপমান-অনাদর ও অস্বীকৃতি, স্বাদেশিকতার নামে আনুষ্ঠানিক আচার-আতিশয্য, এগুলি কবিকে বিচলিত করত তা সে বিদেশী শাসন কিংবা স্বদেশী সাধন যে-নামেই হোক-না কেন। Letters to a Friend গ্রন্থে দীনবন্ধু C. F. Andrews জালিয়ানওয়ালাবাগ-প্রসঙ্গে কবির প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন: "Night after night was passed sleeplessly.... For a time it seemed as though 'Amritsar' had shattered all his hopes and aims.

"But while he felt such intense sensitiveness, as a poet, at the wrong which had been done to humanity in Jallianwalla Bagh, he took his stand at once against any memorial being erected upon the spot as a permanent record of the deed of blood."[১]

যখন চরকা-তত্ত্ব স্বাধীনতা-সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা হল, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতদ্বৈধ দেখা দিল। কিন্তু এটা দুজনের মধ্যে প্রীতি-শ্রদ্ধার সম্পর্কে একটুও ফাটল ধরাতে পারে নি। 'গুরুদেব'-'মহাত্মাজী'র ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ঐ মতদ্বৈধকে অতিক্রম করে বেঁচে রইল। তার কারণ দুটি মহাপ্রাণ

---

১. Rabindranath Tagore, *Letters to a Friend*: edited by C. F. Andrews, George Allen & Unwin, 1928, p. 88

একই "মহাসাগরের পারে"-র সহযাত্রী, ওঁদের মধ্যে কলমের লড়াই অতি চমৎকারজনক রচনা। জালিয়ানওয়ালাবাগ সম্বন্ধে কবি যখন "The Ethics of Destruction" নামে Modern Reviewতে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তার উত্তরে গান্ধীজি "The Great Sentinel" নামে Young Indiaতে (20 October 921) লিখছেন: "His [Rabindranath's] essay serves as a warning to us all who in our impatience are betrayed into intolerance or even violence against those who differ from us. I regard the Poet a sentinel warning us against the approach of enemies called Bigotry, Lethargy, Intolerance, Inertia and other members of that brood."[১]

গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে 'Sentinel' বলে অভিহিত করেছেন। এই অভিধা কবির সম্বন্ধে যে কত সুপ্রযুক্ত এবং অর্থবহ তার প্রমাণ ইতিহাসে চিহ্নিত আছে। যেখানে যখনই অবুদ্ধির গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতার অত্যাচার, আলস-বিলাস-অজ্ঞতার মূঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে, যখনই যেখানে মনুষ্যত্ব অবহেলিত উপক্রত, কবির প্রতিবাদ তখনই মুখর হয়ে উঠেছে। মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন। জীবনের প্রতি তাঁর ছিল অসীম মমতা। মানবতার লাঞ্ছনা, জীবনধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য অবজ্ঞা তাই তাঁকে বিচলিত করে তুলত। স্বাধীনতা-সংগ্রামকেও এই সর্বজনীন কল্যাণবোধের উত্তাপবিহীন পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করেছেন। আর সেইজন্যই তাঁর পক্ষে মুক্তি-আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার আত্মিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সেটাই আবার তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিকূলতার কারণ। তবে কবি ছিলেন অটল: "এতদিন এই নিয়ে কেবলি লড়াই করেছি এবং দেশের লোকের কাছ থেকে নিয়ত মার খেয়েচি। শেষ পর্য্যন্তই মার খেতে রাজি আছি কিন্তু মিথ্যা কথা বল্‌তে পারব না।"[২]

কবির সত্যনিষ্ঠা এবং মানবধর্মের কালজয়ী সাক্ষী 'চার অধ্যায়'। রাজনীতিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসখানি তৎকালীন যুগমানসে গভীর বিক্ষোভের

---

১. *The Ethics of Destruction*, compiled by C. F. Andrews, Tagore & Co., Madras, p. 89

২. চিঠিপত্র ১১, পৃ. ১৯

কারণ হয়েছিল। যে-বিশ্বাস এই কাহিনীর ভিত্তি, সে-বিশ্বাস তদানীন্তন ভাবধারার পরিপন্থী ছিল। সত্য কথা বলতে কি, চার অধ্যায়ের ভাগ্যে যে তীব্র বিরোধিতা জুটেছিল তার তুলনা মেলে রবীন্দ্রনাথেরই 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের প্রকাশান্তর বিক্ষোভে। উপন্যাসটির ইংরেজি তর্জমা-সম্পর্কে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে কবির উক্তি যেন এক স্থিতধীর বাণী : "ও বইটা নিয়ে আমার দেশবাসীর মধ্যে নিন্দাপ্রশংসার তুমুল তোলাপাড়া চলচে। বিদেশেও যদি নিন্দিত হয় তা হলে আমাকে অনেক লাঞ্ছনা সইতে হবে। কিন্তু আজকাল আমার মন নিন্দাপ্রশংসায় অত্যন্ত উদাসীন হয়ে আসচে।"[১] ঐ বিক্ষোভের স্মৃতি এবং কারণ আজও বোধ হয় মিলিয়ে যায় নি। তাই বহুবিতর্কিত রচনা কালের তরী বেয়ে রসোত্তরণের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু 'চার অধ্যায়' বোধ হয় আজও "হতাশের নিষ্ফলের দলে"।

সার্থক রচনামাত্রেরই দুটি দিক আছে : একটি হল সাহিত্যরূপ, অন্যটি Philosophy of life বা জীবনবাদ। "Poetry is life's criticism": এই সুপ্রসিদ্ধ উক্তির মধ্যে গভীর তাৎপর্য আছে। রচনা যখন জীবনবাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় তখনই সৃষ্টি হয় সার্থক। জীবনবাদকে বর্জন করলে রচনা তো শব্দসমষ্টির অলি-গুঞ্জরন। তেমনি আবার সাহিত্যিক দিক বাদ পড়লে যা তৈরি হয়, তা কবির ভাষায় "এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর পত্র"। অবশ্য এ কথা সত্য যে, সাহিত্যকার জীবনবাদকে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতে বসেন না, বসলে তা সাহিত্য হয় না। কিন্তু তাঁর রচনাস্রোত এক নির্দিষ্ট জীবনবাদের পথ বেয়ে প্রবাহিত হয়। তটকে বাদ দিয়ে যেমন তটিনীকে কল্পনা করা যায় না, তেমনি জীবনবাদ-শূন্য রচনাও সাহিত্যিক সত্তাহীন, সাহিত্যক্ষেত্রে এই সত্য যে কত বড়ো সে বিষয়ে Georg Lukacs-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য : "It is the view of the world, the ideology or *Weltanschauung* underlying a writer's work, that counts।"[২]

---

১. চিঠিপত্র ১১, পৃ. ১১৪

২. *The Meaning of Contemporary Realism*, Merlin Press, 1963, p. 19

চার অধ্যায়ের বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য— গ্রন্থে ব্যক্ত বিশ্বাস ও জীবনবাদ। সে-যুগের পাঠক কাহিনীর দিকটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জীবনবাদের দিকটা নিয়েই ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন। এই আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি কবিকে ব্যথিত করেছিল। চার অধ্যায় সম্বন্ধে 'কৈফিয়ত' দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন : "আমার চার অধ্যায় গল্পটি সম্বন্ধে যত তর্ক ও আলোচনা উঠেছে তার অধিকাংশই সাহিত্য-বিচারের বাইরে পড়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ, এই গল্পের যে ভূমিকা, সেটা রাষ্ট্রচেষ্টা-আলোড়িত বর্তমান বাংলাদেশের আবেগের বর্ণে উজ্জ্বল করে রঞ্জিত। আমরা কেবল যে তার অত্যন্ত বেশি কাছে আছি তা নয়, তার তাপ আমাদের মনে সর্বদাই বিকীরিত হচ্ছে। এইজন্যেই গল্পের চেয়ে গল্পের ভূমিকাটাই অনেক পাঠকের কাছে মুখ্যভাবে প্রতিভাত। এই অধুনাতন কালের চিত্ত-আন্দোলন দূর অতীতে সরে গিয়ে যখন ইতিহাসের উত্তাপবিহীন আলোচ্য বিষয়মাত্রে পরিণত হবে তখন পাঠকের কল্পনা গল্পটিকে অনাসক্তভাবে গ্রহণ করতে বাধা পাবে না এই আশা করি। অর্থাৎ তখন এর সাহিত্যরূপ স্পষ্ট হতে পারবে।"[১] তাঁর বিশ্বাস ছিল, সময়ের ব্যবধানে যখন ভাবালুতার বাষ্পাচ্ছন্নতা কেটে যাবে, তখন উত্তরকাল রচনাটির সাহিত্যরস উপভোগ করতে সমর্থ হবে।

আজ প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধান। এখন ইতিহাসের উত্তাপবিহীন দৃষ্টি নিয়ে চার অধ্যায়ের নিহিত জীবনবাদকে অন্বয় করবার মতো নিরাসক্তি জেগেছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাহিনীর সত্যরূপ যে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছে তা মনে হয় না। একালীন সমালোচনার ধুয়া হল : তত্ত্বের খরতাপে সাহিত্য-রূপ শুকিয়ে গিয়েছে। লেখক যেন একটা মত প্রচার করবার জন্যই লিখতে বসেছেন ; অতএব তাঁর মন প্রচারকার্যে এত বেশি ব্যাপৃত যে কাহিনীর সাহিত্য-রূপের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নি। 'সাহিত্যকার'— এই পরিচয়টাই যাঁর কাছে সব চেয়ে প্রিয় ছিল তিনিই নাকি রচনার সাহিত্যিক দিকের প্রতি উদাসীন !— এমন একটা অভিযোগ বড়োই অদ্ভুত লাগে। এ কথা অবশ্য কেউই অস্বীকার করবেন না যে, চার অধ্যায়ে জীবনবাদের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। কিন্তু তাই বলে যে তার সাহিত্যিক গুণ কিছু হ্রাস পেয়েছে তা মেনে নেওয়া কঠিন। জীবনবাদের দৃঢ় অঙ্গুলি-

৩. র-র ১৩, পৃ. ৫৪৪

সংকেত তো রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাতেই আছে— গোরা, ঘরে-বাইরে, রক্তকরবী, অচলায়তন, তাসের দেশ প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। এগুলির গায়ে জীবনবাদের দাগ লেগেছে বলে কি তারা সাহিত্য-সমাজে অন্ত্যজ? রবীন্দ্রনাথ "ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল অত্যাড়ম্বরের" হঠাৎ-নবাবিকে অবজ্ঞা করতেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন: "প্রব্‌লেমের গ্রন্থি-মোচন ইন্‌টেলেক্‌টের বাহাদুরি, কিন্তু রূপকে সম্পূর্ণতা দেওয়া সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনার কাজ, আর্ট এই কল্পনার এলেকায় থাকে, লজিকের এলেকায় নয়।"[১] সুতরাং এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না যে, কবি শেষপর্যন্ত "সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা"কে উপেক্ষা করে "ইন্‌টেলেক্‌চুয়েলের অত্যাড়ম্বরে" মোহিত হয়ে পড়েছিলেন।

গোরা এবং ঘরে-বাইরে-র তত্ত্বপ্রাধান্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: "সাহিত্যের তরফ থেকে বিচার করতে হলে দেখা চাই যে, সেগুলি জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে। আহার্য জিনিস অন্তরে নিয়ে হজম করলে দেহের সঙ্গে তার প্রাণগত ঐক্য ঘটে। কিন্তু ঝুড়িতে করে যদি মাথায় বহন করা যায় তবে তাতে বাহ্য প্রয়োজন সাধন হতে পারে, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় না। গোরা-গল্পে তর্কের বিষয় যদি ঝুড়িতে করে রাখা হয়ে থাকে তবে সেই বিষয়গুলির দাম যতই হোক-না, সে নিন্দনীয়। আলোচনার সামগ্রীগুলো গোরা ও বিনয়ের একান্ত চরিত্রগত প্রাণগত উপাদান যদি না হয়ে থাকে তবে প্রব্‌লেমে ও প্রাণে, প্রবন্ধে ও গল্পে, জোড়াতাড়া জিনিস সাহিত্যে বেশিদিন টিঁকবে না।"[২] চার অধ্যায় সম্বন্ধেও সেই একই প্রশ্ন: সেখানে তত্ত্ব জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে? জীবনবাদ যদি চরিত্র-ক'টির প্রাণগত উপাদান না হয়ে থাকে, তবে সাহিত্য-সৃষ্টি হিসেবে চার অধ্যায় অবশ্যই ব্যর্থ। এলা-অতীন্দ্র-ইন্দ্রনাথের আপন আপন ব্যক্তিমানসই যদি রূপ না পেল, তবে আর কাহিনীর সাহিত্যিক মূল্য কোথায়!

প্রত্যেক মানুষের একটা অভিজ্ঞতার কাঠামো আছে, মনস্তত্ত্বে যাকে বলা হয় "frame of reference"।[৩] এই কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হল তার স্থিতিস্থাপকতা।

---

১. "সাহিত্যের মাত্রা", সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ. ১৯

২. তদেব

৩. পরে এ বিষয়ে স্বল্প-বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কাঠামোটা প্রসার লাভ করে। অভিজ্ঞতার কাঠামোর মাধ্যমে বিকশিত হয় জীবনবাদ— জীবনকে বিশেষ ভাবে দেখবার বুঝবার জানবার অনুভব করবার দৃষ্টিকোণ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে কতকগুলি মৌলিক প্রবৃত্তি নিয়ে। এই প্রবৃত্তি-সমষ্টি প্রতিবেশের রৌদ্রছায়ায় ক্রমস্ফুট হয়ে গড়ে তোলে মানুষের আদর্শ-বিশ্বাস, শ্রেয়-প্রেয়বোধ, তার জীবনবাদ। মানুষ যে তার জৈবিক অস্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারে, ব্যাবহারিক জীবনই তার সকল-কিছু নয়, সে যে খোঁজে শ্রেয়ঃপথের নিশানা। জীবনবাদ হল এই অন্বেষণের আত্মিক রূপ। যদি কোনো ব্যক্তিমানসকে বুঝতে হয়, তবে তার জীবনবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

চার অধ্যায়ের নায়ক-নায়িকা এমন দুটি চরিত্র যাদের ব্যক্তিত্ব শিক্ষায় দীক্ষায় বৈদগ্ধ্যে সুগঠিত, যাদের মননধর্মিতা সুনির্দিষ্ট। আপন আপন শ্রেয়োবোধের মানদণ্ডে বিচার করে তারা বেছে নিয়েছে নিজ নিজ জীবনের পথ। কিন্তু কোথায় যেন তাদের বিচারে ভুল হয়ে গেল, হিসেবে ঘটল মস্ত একটা গরমিল। দুঃসহ-বিষণ্ণ সমাপ্তির কিনারায় দাঁড়িয়ে তারা আপন আপন জীবনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের জানবার চেষ্টা করে— কোথায় ভুল হল, কেনই বা হল। তাদের ভ্রান্তি ও ভ্রান্তি-সঞ্জাত বেদনাকে অনুভব করতে না পারলে তারা আমাদের কাছে অচেনা অস্পষ্ট অলীক থেকে যাবে। আর, তাদের ভ্রান্তিকে বুঝবার জন্য তাদের জীবনবাদ বুঝতে হবে যার জারক রসে সঞ্জীবিত তাদের চরিত্র-মানস। অন্যথায় বৃন্তকে বাদ দিয়ে ফুলের পরিপূর্ণ রূপ উপভোগ করবার মতোই অপচেষ্টার দোষ ঘটবে। অতীন্দ্র এলা ইন্দ্রনাথ কেউই জীবনবাদের ঝুড়ি মাথায় চাপিয়ে চলে না ; জীবনবাদের সঙ্গে তাদের প্রাণগত ঐক্য। যখনই পাঠক-মন এই ঐক্য অনুভব করতে পারে তখনই চরিত্র-ক'টি তার কাছে গোটা মানুষ হয়ে ওঠে, তখনই চার অধ্যায়ের সাহিত্যরূপ রঙে রেখায় উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়। প্রকৃত-পক্ষে, এই উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্যই হল সাহিত্য এবং জীবনবাদের সুমিত সমন্বয়।

কাহিনীর আরম্ভে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহোদয়ের জীবন-সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনার আভাস। বিপ্লব-প্রবণ পোলিটিকাল যুগে যদি একজন বিপ্লবীর মুখে শোনা যায় : "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে", তবে তার প্রতিক্রিয়া অনুমান করা কঠিন নয়। এমন একটি স্বীকারোক্তির মাঝে ভাবপ্রবণ বাঙালিমন বিপ্লবী বীরদের

প্রতি এই কটাক্ষপাত তির্যক বলে ধরে নিল এবং ভাবল এটা যেন একমাত্র ইংরেজদের খয়ের খাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাই এমন কথাও শোনা গিয়েছিল সে-যুগে, রবীন্দ্রনাথ নাকি এই কাহিনী ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়ের প্ররোচনাতেই লিখেছেন!

কবি দেশকে ভালোবাসতেন না, এইরকম অভিযোগ অনেকবার উঠেছে। অনেক নিন্দা-অপমান তাঁকে সইতে হয়েছে এই কারণে। কটু সমালোচনা যে কেবলমাত্র "কটুভাষা-ব্যবসায়ী সাহিত্যিক 'গুণ্ডা'"দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়; দেশের "গণ্যমান্য এবং শিষ্ট-শান্ত ব্যক্তিরাও" তাঁর সম্বন্ধে ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি। এটাই কবির বেদনার কারণ ছিল। ঘরে-বাইরে প্রকাশের পর এ জাতীয় অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "আর একটি কথা এই যে, আমিও দেশকে ভালোবাসি; তা যদি না হত তা হলে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের পথ নয়, সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না, কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তা হলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করি নি।"[১] জনপ্রিয়তার লোভ কোনোদিনই তাঁকে সত্যভ্রষ্ট করে নি। কালিমা গায়ে নিয়েছেন, তবু সত্যভাষণে দ্বিধা করেন নি কখনো। বলেছেন: "অথচ এদেশের মানুষ পদে পদে আমাকে কঠিন আঘাতে জর্জ্জর করেছে, নির্ম্মমভাবে আমাকে অবমানিত করেছে, অসহ্য হয়েছে কতবার, নিঃশব্দে আমি তা সহ্য করে এসেছি, তবুও আজ পর্য্যন্ত বল্‌তে পারলুমনা তোমাদের আমি চাইনে।"[২]

স্বাদেশিকতার পটভূমিকায় চরিত্রগুলির ভিতর দিয়ে কবি সাধারণত দুজাতীয় মানুষ সৃষ্টি করেছেন— হাঁ-ধর্মী এবং না-ধর্মী। দেশেরও দুটো পরিচয়: একদিকে দেশ নদী-পাহাড়ের বেড়া-দেওয়া ভৌগোলিক ভূখণ্ড, আর-এক দিকে দেশের আত্মা। ভৌগোলিক ভূখণ্ড তখনই দেশ হয়ে ওঠে যখন মানুষ আত্মশক্তির সাহায্যে "আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে" তাকে চিন্ময় করে তোলে।

১. র-র ৮, পৃ. ৫২৬

২. চিঠিপত্র ১১, পৃ. ১০৭-৮

মৃন্ময় থেকে চিন্ময় : এই রূপান্তরই দেশের প্রকৃত পরিচয়।

না-ধর্মীর দেশ-প্রেমে অনেকখানি স্থূল লোলুপতা আছে। ভৌগোলিক গণ্ডিটাই তার কাছে একমাত্র সত্য। না-ধর্মীর দৃষ্টি কখনো এই গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না, গণ্ডির অন্তস্তলেও প্রবেশ করতে পারে না। আশু ফললাভের এক অপরিমেয় লোভ তাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে। যেমন-তেমন ক'রে সিদ্ধি লাভ করলেই হল। দেশের আত্মিক সত্তার কথাটা তার কাছে, সন্দীপের ভাষায়, "ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে" বেড়ানোর মতো উপহাস্য। কিন্তু হাঁ-ধর্মীর কাছে দেশের আত্মাটাই বড়ো। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় আত্মা সম্বন্ধে একটি সহজ সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন : "... আত্মার কাজ আত্মীয়তা করা।"[১] তাই দেশের আত্মার অন্বেষণে হাঁ-ধর্মীর দৃষ্টি বেড়া ডিঙিয়ে যায়, খুঁজে বেড়ায় মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র। তার পথ দুঃখের। তার তপস্যা প্রেমের। নিখিলেশের কথায় তার মর্মবাণী শোনা যায় : "দেশ যেখানে বলে 'আমি আমাকেই লক্ষ্য করব, সেখানে সে ফল পেতে পারে, কিন্তু আত্মাকে হারায় ; যেখানে সকলের চেয়ে বড়োকে সকলের বড়ো করে দেখে, সেখানে সকল ফলকেই সে খোওয়াতে পারে, কিন্তু আপনাকে সে পায়।"[২] না-ধর্মী সন্দীপ যখন বলে : "আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার," তখন হাঁ-ধর্মী নিখিলেশের দৃঢ় উত্তর শোনা যায় "আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।"[৩] স্বাধীনতা-আন্দোলনের যে-যে দিকে "আজকের দিনের ফলটা"-ই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দেখা দিয়েছিল অসহনশীল ভাবোন্মত্ততার অমিতাচার। সাধারণ মানুষের প্রতি স্বার্থান্ধ ঔদাসীন্য। অসহযোগ আন্দোলন যখন নুন-চিনি-কাপড়ের লড়াই হয়ে দাঁড়াল, তার অমানবিক অর্থহারা আতিশয্য কবির কাছে গণ-উপদ্রবের নামান্তর বলে প্রতিভাত হল। নিখিলেশের মাস্টারমশাই চন্দ্রবাবুর জবানীতে তাই শুনতে পাই : "দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই-সমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন

১. "সৌন্দর্যের সম্বন্ধ", পঞ্চভূত, পৃ. ৭২

২. র-র ৮, পৃ. ২১৩

৩. তদেব, পৃ. ২৫৭

একবার চোখের কোনে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ, এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন?"[১] স্বরাজ-সাধনা যখন মানুষকে উপেক্ষা ক'রে দেশকে উপদ্রবের লঙ্কাকাণ্ডে পরিণত করে, তখন তা শুধু "স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল" দেবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। মানুষ নিয়ে দেশ, মানুষই হল দেশের আত্মা। উপদ্রবের রথ যদি তারই বুকের উপর দিয়ে নির্মম ঔদাসীন্যে ছুটতে শুরু করে, তবে সে রথের মাথায় স্বাদেশিকতার পতাকা থাকলেও হাঁ-ধর্মী দেশপ্রেমিকের কাছে সেটা হবে শত্রুযান। তার কর্কশ চক্রধ্বনির মাঝে এক বৈনাশিক অমানবিক উল্লাসের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়। সন্ত্রাসবাদের মাঝেও সেই এক সুর; অতীন্দ্রের ভাষায়: "দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা"-র প্রাগভিশপ্ত উন্মত্ত চেষ্টা। বরং তার রূপ আরো ভয়ংকর, কারণ "মুখোশ-পরা চুরি-ডাকাতির অন্ধকারে" তার হিংস্র পদসঞ্চারণ। মনুষ্যত্ব সেখানে অবহেলিত উপদ্রুত। মানুষের আত্মা অধোগত।

হাঁ-ধর্মীর জীবনবাদের বনিয়াদ হল মানুষ। মানুষের পরিপ্রেক্ষিতেই স্বাধীনতার সার্থকতা বিচার্য। স্বাধীনতা চাই, কারণ আত্মকর্তৃত্বের অধিকার না পেলে মানুষের মূল্য মানুষের শ্রদ্ধেয়তা কখনোই স্বীকৃতি পায় না। পরাধীনতা হীন, সে মনুষ্যত্বের বিনাশ ঘটায়। বিপ্লবী ইন্দ্রনাথ সে কথা বিশ্বাস করত; সে বলেছে: "ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে..." (পৃ. ৪০)। আত্মলোপ মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ, আত্মস্বীকৃতিই তার লক্ষ্য। পরবশতা নীতিহীন, কারণ সে আত্মবিলোপের পথ প্রশস্ত করে দেয়। স্বভাবের পূর্ণ প্রকাশের জন্য, সার্বিক জীবনের প্রাণময় উপলব্ধির জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। মানুষের ব্যক্তিত্ব যথাযথ স্বীকৃতি পাবে— এই মানবিক আদর্শই স্বাধীনতালাভের আকুতি জাগায় প্রেরণা জোগায়। "মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি"[২]; কবি-বর্ণিত এই ধর্মবুদ্ধি হল স্বরাজ-সাধনার প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। ব্যক্তিত্বের অবমাননা-অবহেলা উপদ্রব-অবরোধ এই ধর্মবুদ্ধিকে

---

১. র-র ৮, পৃ. ২৩৬

২. "হিন্দু-মুসলমান", কালান্তর, পৃ. ৩২৪

আহত করে। তারা অবুদ্ধি-সঞ্জাত। পরাধীন দেশে উপদ্রব-অবরোধ-অবমাননার উৎস হল বিদেশী শাসন। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে : অপরাধ যে কেবল শাসকেরই তা নয়। কারণ স্বাদেশিকতার পবিত্র মানবিক আদর্শের আড়ালে আছে শ্রেণী-বিভাগ, সংকীর্ণমনা অবিশ্বাস, পরশ্রীকাতরতা, আত্মকলহ, সবলের আধিপত্য। মানুষ যেখানে ক্ষীণদৃষ্টি আত্মসুখসন্ধানী, সেখানে সে অবুদ্ধির তামস-জালে বন্দী। তখন সে আত্মক্রান্তির শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন—অবুদ্ধির কুয়াশাজয়, ভেদবুদ্ধির মোহমুক্তি ; আন্তর্ব্যক্তিক সহযোগিতা। এমনি করেই আত্মশক্তির ক্রমোন্মেষ। এমনি করেই জেগে ওঠে এক সার্বিক কল্যাণরূপ।

স্বাধীনতা আন্দোলন যখন সমস্ত দেশবাসীকে অন্তরের দিক থেকে যুক্ত করেছে, কবি তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে জাতি-মিলনের গান রচনা করেছেন : "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।" বলেছেন : "ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে।" সেই আহ্বানের সার্থকতা "ক্রুদ্ধ গর্জনের" মধ্যে নয়, "হিংস্র উত্তেজনার মুখরতার" মধ্যেও নয়। তার ঐতিহাসিক এবং আত্মিক মূল্য এই যে, সে দেশের অন্তরাত্মাকে প্রবুদ্ধ করেছে— "সেবায় আমাদের সংকোচ নাই, কর্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে, পরের সহায়তায় আমরা উচ্চনীচের বিচার বিস্মৃত হইয়াছি, এই-যে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি— এবার আমাদের উপরে যে আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সংকীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে, ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে।"[১]

"মানুষের দিকে মানুষের টান"—এই তো মানবতার কেন্দ্রকথা, স্বরাজ্যের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রের প্রণোদনায় "…নিত্য-সম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব— সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুঞ্জয়ী, যে চির-জাগরূক চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণহস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নব নব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশে দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।"[২] প্রেম ও সত্যের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন—

---

১. "সমস্যা", রাজাপ্রজা, র-র ১০, পৃ. ৪৮৩

২. "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম", কালান্তর, পৃ. ৮৩

মহাত্মাগান্ধীর সত্যাগ্রহে এই প্রেমের ধর্ম দীক্ষিত ছিল বলে কবি উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন: "আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহু দিনের রুদ্ধ দ্বারে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল। কারো মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল।"[১]

অতিশয়-পন্থার মধ্যে শুভবুদ্ধির স্বাক্ষর নেই। তাই কবির কাছে সেটা মনুষ্যত্বের অবমাননার পথ। কি বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি, কি স্বদেশী মুক্তিসংগ্রাম—কারো অতিশয়-পন্থা কবির কাছে আমল পায় নি। একবার "এক ভারতজীবী ইংরেজ কাগজ" তাঁকে এক্স্‌ট্রিমিস্ট্ বলে সমালোচনা করেছিল। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয়-পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনোই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ংকর ভারী হইয়া উঠে। সে যাই হোক, দিশি বা বিলিতি যে-কোনো কালিতেই হোক-না আমার নিজের নামে কোনো লাঞ্ছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে পন্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে-বিপদে চলাকেই এক্স্‌ট্রিমিজম্ বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি; সেইজন্যই আমি জোরের সঙ্গে বলিবার অধিকার রাখি যে, এক্স্‌ট্রিমিজম্ গবর্মেণ্টের নীতিতেও অপরাধ।"[২]

সন্ত্রাসবাদ অতিশয়-পন্থার পথিক। সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ ক'রে সুড়ঙ্গ-পথে রাতারাতি লক্ষ্যে পৌঁছবার আগ্রহ তাকে উন্মাদনা জোগায়। সন্ত্রাস-বাদী বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন: "দেশভক্তির আলোক জ্বলিল, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন্ দৃশ্য দেখা যায়— এই চুরি, ডাকাতি, গুপ্তহত্যা? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ্য লইয়া

১. "সত্যের আহ্বান", কালান্তর, পৃ. ২০১

২. "ছোটো ও বড়ো", কালান্তর, পৃ. ১০০-০১

তাঁহার পূজা?"[১] এই আন্দোলন তাঁর কাছে "পোলিটিকাল চৌর্যবৃত্তি" রূপে প্রতিভাত হয়েছে। এর দৈন্য ও জড়তার মাঝে তিনি যে আত্মশ্রদ্ধার অভাব দেখতে পেয়েছিলেন, তা মানবতার পরিপন্থী। অবশ্য সন্ত্রাসবাদের গোপনচারী সাধনায় যাঁরা নিজেদের আহুতি দিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে কবি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন: "সেই বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে এক দল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন। আর যাই হোক, এই প্রলয়-হুতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন, এইজন্যে তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই সকলেরই নমস্য। তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।"[২] এত মহান আত্মত্যাগ, তবু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল তাঁদের প্রচেষ্টা। এর জন্য দায়ী শুধু পথ।

জাতির জীবনে স্বরাজ-সাধনার আত্মিক মূল্য গভীর। এ তার নিজেকে সৃষ্টি করার সাধনা। এ তার মোহমুক্তির মন্ত্র, আত্মশুদ্ধির, আত্মজাগৃতির তপস্যা। ব্যক্তিমানুষের পূর্ণ বিকাশের জন্য যে-আত্মকর্তৃত্বের প্রয়োজন তার সাধনায় 'শর্ট-কাট' নেই। বস্তুত কোনো মহৎ কাজই 'শর্ট-কাট'-এর পথ ধরে সফল হয় না। "যে জিনিসের যা দাম তা পুরো না দিতে পারলে দাম তো যায়ই, জিনিসও জোটে না!"[৩] স্বাধীনতার লক্ষ্য মহৎ। সে লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ হল সত্যাশ্রয়ী ন্যায়ধর্মী মানবতার আলোয় উজ্জ্বল। এ পথের অভিযাত্রী যারা তাদের প্রাণে অতীন্দ্রের কথাই অনুরণিত হয়। "...পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্মে বড়ো..." (পৃ. ৯২)।

"পরম-নিঃশব্দ গরম-পন্থা" অবৈধ; তার একটা বড়ো কারণ হল এখানে নীতির প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়ে থাকে। সন্ত্রাসবাদী বিশ্বাস করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতির চেয়ে শক্তির খেলাটাই আসল। "কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদ সাধন" অবৈধ তো নয়ই, বরং প্রয়োজনীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব: এর মধ্যে অন্তর্বিরোধ আছে। অধর্মের সাহায্যে যে সাফল্য-লাভ

---

১. "ছোটো ও বড়ো", কালান্তর, পৃ. ১০৩

২. "সত্যের আহ্বান", কালান্তর, পৃ. ১৯৮

৩. তদেব

করা যায় এ কথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না ; বরং হয়তো অতি সহজেই করা যায়। কিন্তু সেই লাভে ক্ষতির অঙ্ক মস্ত বড়ো হয়ে পড়ে, কারণ মানবিক শ্রেয়োবোধ বিনাশ পায় সমূলে। ভারতবর্ষের চিন্তাধারার সঙ্গে এই সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির কোনো আত্মিক যোগ নেই ; এর গায়ে "পশ্চিমে তৈরি" ছাপ আছে। এই সুবিধাবাদী নীতি-অন্ধ মতবাদের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্বন্ধে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে তাঁরা "পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ মিশানোর মতো মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। আমরাও শিখিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে বসাইয়া ধর্ম লইয়া টিক্‌ টিক্‌ করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্বলতা, ইহা সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্‌— বর্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে এবং অধর্মকে দিয়াই ধর্মকে মজবুত করা চাই। এমনি করিয়া আমরা যে কেবল অধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছি তাহা নহে, আমাদের গুরুমশায়দের যেখানে বীভৎসতা সেই বীভৎসতার কাছে মাথা হেঁট করিয়াছি।"[১]

বিদেশী গুরুমশায়দের কাছে যে-সহিংস পন্থার দীক্ষা নিয়েছে স্বদেশী সন্ত্রাসবাদ, তার কাছে লক্ষ্যটাই বড়ো। লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, তবে যেমন করে হোক রাতারাতি সেখানে পৌঁছতে হবে ; গুপ্ত দস্যুবৃত্তি খুনোখুনি কিছুই অবৈধ নয় যদি তারা আশু ফললাভের লোভটাকে চরিতার্থ করতে পারে। Sanctity of means বা পথের শুচিগুণ ব'লে সন্ত্রাসবাদীর অভিধানে কিছুই নেই। এইখানেই মানবতাবাদের সঙ্গে সুবিধাবাদের গভীর বিভেদ। মানবধর্মী বলে : "পথের চেয়ে অপথ মাপে ছোটো ; কিন্তু সেটাকে অনুসরণ করতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না, মাঝের থেকে পাতুটোকে কাঁটায় কাঁটায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়।"[২] লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার জন্য মানবতাবাদ কখনো এমন পথ বেছে নেবে না যে-পথ শুভবুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করে, "মানুষের প্রতি মানুষের টান"কে পারস্পরিক অবিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চায়। মনুষ্যত্ব-বিমুখ পথ দিয়ে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছনোর চেষ্টা, অতীন্দ্রের ভাষায়, "কুমিরের পিঠে চড়ে" নদী পার হওয়ার মতোই অপচেষ্টা।

---

১. "ছোটো ও বড়ো", কালান্তর, পৃ. ১০২

২. "সত্যের আহ্বান", কালান্তর, পৃ. ১৯৮

সুড়ঙ্গ-বিহারী সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা হল: "An underground, defined technically, consists of 'clandestine organizational elements of politics— military movements attempting to illegally weaken, modify, or replace an existing governing authority'."[১]

ত্রাস ছড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ আপন উদ্দেশ্য সফল করতে চায়। উদ্দেশ্য: ক্ষমতাসীন প্রতিপক্ষের (সামরিক-অসামরিক নির্বিশেষে) হয় অপসারণ, নয় পরিবর্তন। উপায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান। তার জন্য প্রয়োজন: সুড়ঙ্গ-বিহার, গোপন প্রস্তুতি, চোরা পথে অস্ত্রসংগ্রহ ইত্যাদি। উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করবার জন্য এমন কাজ নেই যা সন্ত্রাসবাদী করতে পারে না। চুরি-ডাকাতি-প্রাণনাশ: এগুলো সন্ত্রাসবাদীর চোখে মানববিদ্বেষী কাজ নয়। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদ কিছু সাজ-সজ্জা পালটেছে বটে, কিন্তু আরো নৃশংস হয়েছে। আজকের সমাজে যে-হিংসাপ্রবণ মনোবৃত্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে, নব-সন্ত্রাসবাদ কি তারই ফল? আজকাল সংবাদপত্রে উদাহরণ-স্বরূপ প্রায়ই প্রকাশিত হয় বিমান-ছিনতাইয়ের ঘটনা। এই বিমান-দস্যুরা এক ধরনের আদর্শবাদী, তবে সেই আদর্শবাদ তাদের পাশবিক নৃশংসতার উপর প্রলেপ-মাত্র। এখানে-ওখানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে-ওঠা দলগুলি নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের দাবি: "যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এটা-না-করো ওটা-না-করো, তা হলে যাত্রীসহ বিমানটাই ধ্বংস করব।" কী মানবতা-বিরোধী অনীহা! যেন যাত্রীরা মানুষ নয়, মানুষ হিসাবে তাদের জীবনের যেন কোনো মূল্যই নেই, বলির পশুর পরিচয়ে যেন মানুষের পরিচয়।

কোনো কোনো গোপনচারী সহিংস দল কাপালিকের মতো ধর্মের মুখোশ পরে ব্যক্তি-হত্যায় লিপ্ত হয়। তারা প্রমাণ করতে চায় যে, তাদের হুমকি অগ্রাহ্যের ব্যাপার নয়। এই হত্যাকাণ্ড চলবে যতক্ষণ না তাদের দাবি মেনে নেওয়া হয়।

এইরকমের সহিংস সন্ত্রাসবাদের কাছে মনুষ্যত্বের কোনো মর্যাদা নেই, মানব-জীবনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই, মানুষের রক্তস্রোত তাদের মনে এক জান্তব

---

১. Martin Oppenheimer, *Urban Guerrilla*, Penguin Books, 1970, p.70

উল্লাস জাগায়। অতি দুঃখেও হাসি পায় যখন তারা আদর্শের দোহাই দেয়; বলে, এক নূতন মানবিক সমাজ সৃষ্টি করবার জন্যই এই মানুষ-বলির প্রয়োজন! আদর্শের ভাত দিয়ে হিংস্রতার মাছ ঢাকা!

সন্ত্রাসবাদের প্রকৃত মূল্যায়ন হবে না যদি তাকে সহিংস রাষ্ট্র-আন্দোলনের সংকীর্ণ গণ্ডির পটভূমিকায় বিচার করি। সন্ত্রাসবাদের পিছনে যে বিদ্বেষ-বিষ যে হিংস্রতা-মুখী দৃষ্টিকোণ বর্তমান, সেটার প্রকাশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শুধু আন্তর্জাতিক কেন, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের এলাকাটাও দূষিত হয়ে উঠেছে। তাই আজকের দিনে অত্যুন্নত প্রতীচীতেও প্রগতিশীল চিন্তা-নায়কদের মনে দুর্ভাবনা জেগেছে। সবাই এটা স্বীকার করেন যে, সভ্যতার কেন্দ্র-কথা হল "মানুষের দিকে মানুষের টান"। কিন্তু যেখানে হিংস্রতা আবহাওয়াকে দূষিত করে ফেলছে সেখানে এই "মানুষের দিকে মানুষের টান" কেমন করে জাগবে? মার্কিন দেশের কথাই ধরা যাক না। পৃথিবীর মধ্যে যে-দেশ সব চেয়ে উন্নত সেখানেই গণজীবন বিদ্বেষ-বিষে জর্জর। বর্তমান শতাব্দীর ষাট দশকের প্রথমার্ধের অপরাধ-মূলক পরিসংখ্যান-ভিত্তিক F. B. I. রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত করে Howard Jones লিখেছেন: " 'Crime in the last five years increase four times faster than population. Four serious crimes per minute recorded on the crime clock.' The Americans, it seems, have reason to feel worried about their crime problem."[১] যদি প্রতি মিনিটে চারটে করে গুরুতর অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে, তবে সমস্যাটি যে কতখানি ব্যাপক ও দুরূহ হয়ে দেখা দিয়েছে তা দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু পরিস্থিতি আরো বিপজ্জনক বলে মনে হয় যখন দেখা যায়, যেখানে অন্তরঙ্গতার পরিবেশে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান, সেখানেও হিংস্রতার প্রাদুর্ভাব। William J. Goode এই দিকটায় জ্ঞানী-গুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন: "Living in a kind of jungle, human beings become alert, hyper-sensitive to provocation, quick on the trigger, swift to retaliate. This affects

১. *Crime in a Changing Society*, Penguin Books, 1965, p, 11

greatly not only the relations between strangers, but the intimate relations between friends or between men and women who care for one another."[১]

সত্য কথা, মানুষ যেন জঙ্গলের জীব। চক্ষু-কর্ণ-নাসা সর্বদা জাগ্রত, কোন্ দিক থেকে আঘাত আসে; প্রত্যাঘাতে যেন এক মুহূর্ত দেরি না হয়। থাক্-না কেন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ভালোবাসার বন্ধন। পরিবেশ এমন বিষিয়ে উঠেছে যে, যারা এই পরিবেশে বড়ো হচ্ছে তাদের কাছে হিংস্রতা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা বলে গৃহীত হচ্ছে। তাই দেখা যায় আধুনিক সমাজে বীভৎস রসের প্রভাব উত্তরোত্তর সীমা ছড়িয়ে, সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমন-কি, আমোদ-প্রমোদ-অবসরবিনোদনের আয়োজনে বীভৎস রসের ঢালাও বিতরণ-ব্যবস্থা। সবের মূলে আছে, কৃষ্টি-সংস্কৃতির অপদেবতারা যাদের মহুয়াবনে চোলাইখানা থেকে মাতাল হাওয়া অনুক্ষণ দিগ্‌বিদিকে ছোটে: উচ্ছৃঙ্খল, অসহিষ্ণু, পরপীড়ক বা নাশকতার ছোঁয়াচ-ছড়ানিয়া হাওয়া।

বিশিষ্ট অর্থে চার অধ্যায় এই বর্তমান অবস্থারই এক ভবিষ্যদ্‌বাণী।

মানবতার দিক থেকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আর-একটা বড়ো অভিযোগ: ব্যক্তিত্ব-বিলোপ। সন্ত্রাসবাদে ব্যক্তিত্বের মর্যাদা নেই। দলের কাজ ব্যক্তিত্ব-দলন। সুড়ঙ্গ-বিহারীদের পক্ষে দলীয় একনিষ্ঠা অপরিহার্য। গুপ্তপথে যখন লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে, তখন দলগত ঐক্যের অভাব ঘটলে গোপনতার আবরণ ঘুচে যাবার সম্ভাবনা। সমষ্টি-মানসের কাছে ব্যক্তি-মানস মূল্যহীন বলে দলের কাছে মতবিরোধ কঠিন অপরাধ, দলগত স্বার্থের অন্তরায়। "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম"— এই নীতি অনুসরণের ফলে যূথপতির আদেশ অমান্য গুরুতম অপরাধ। যদি আদেশ রুচি-বিরোধী, শ্রেয়োবোধদ্রোহী স্বধর্ম-সংহারী হয়, তবুও অনুচরকুলের কাছে তা বেদবাক্য। যার মনে সংকোচ বা প্রশ্ন জাগবে তার পক্ষে দলের সংস্রব ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। আর, যূথপতি যদি মনে করে তার দিক থেকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে, তবে তার জীবন সংশয়-সঙ্কুল। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম: এই নীতি

---

১. *Explorations in Social Theory*, Oxford University Press, 1973, p. 184

অনুসরণের ফলে সন্ত্রাসবাদী দলের ইতিহাস এক পুতুলনাচের ইতিবৃত্তে রূপান্তরিত হয়। আত্মকর্তৃত্বের অধিকার লাভের আশায় যে-সাধনার শুরু, তারই শেষ পরিণাম হল আত্মকর্তৃত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধন। ভুক্তভোগী অতীন্দ্র গভীর ক্ষোভের মুখে এই নির্মম সত্যের একটি রূপময় বর্ণনা দিয়েছে : "মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে— এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উল্টোরথের যাত্রায়। ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির 'পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারী পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে— একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওয়ালা যেই একটু আল্‌গা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ-পুতুল" (পৃ. ৭১-৭২)। কিন্তু সে শক্তি যান্ত্রিক, আত্মিক নয়। আজকের দিনে মানুষ সে কথা স্বীকার করছে। দেহকে তালিম দিয়ে তাল-ঠোকা শেখানো যায়, কিন্তু তার সঙ্গে তাল রেখে মনকেও যদি নিরন্তর চলতে হয়— 'কেন-কোথায়-কি' : এই প্রশ্নগুলোকে নিঃসংকোচ আনুগত্যের গ্যাস-চেম্বারে জ্বালিয়ে দিয়ে— তা হলে অচিরেই মানুষ বিকারগ্রস্ত অমানুষ হয়ে পড়ে। এ যুগের ইতিহাসেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। অতীন্দ্রের ভাষায়, মানুষ হল "আত্ম-শক্তির বৈচিত্র্যবান জীব।" মানুষ বৈচিত্র্যবান জীব কেননা সে "স্রষ্টা"— সে সারা জীবন আপন সত্তাকে সৃষ্টি করতে করতে চলে। J. Bronowski-র ভাষায় : "Man is a machine by birth but a self by experience."[১]

আশৈশব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেকে একজন 'ব্যক্তি' (আপনাকে যে বিশেষভাবে প্রকাশ করতে পারে) করে তুলতে পারে : এটাই তার আত্মসৃজন, এখানেই তার বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যকে কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে, তার চেতনাকে তার ভাব-ভাবনা-ইচ্ছাকে যখন কোনো যূথপতির নির্দেশ-সম্মত ছাঁচে ঢালাই

---

১. *The Identity of Man*, Heinemann, 1966, p. 106

করা হয়, তখন মানুষের অবস্থা গ্রীকপুরাণ-কথিত প্রোক্রাটেসের বলির মতো দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

তালিম-দেওয়া মনোবৃত্তি আজকের দিনে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে। যেন আরব্যোপন্যাসের বোতল-বাসী দৈত্যটার মতো! এও তো একরকমের সন্ত্রাসবাদ। গোষ্ঠী বেঁধে দিয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার ছন্দ— পোশাক-আসাকে চলায়-বলায় ভাবে-ভাবনায়। তারি তালে তালে পা মিলিয়ে চলতে হয় তাকে। একটু যদি বেতাল হল কারো চরণ-ফেলা, পঞ্চায়েতের রক্তচক্ষু বিদ্রূপ তার প্রাণে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। এই কারণে বর্তমান যুগকে Age of Conformity আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগে যে ব্যক্তিক বিকাশের মহড়া শুরু হয়েছিল সমাজে রাষ্ট্রে ধর্মে দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে, তা আজ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে মানুষ না-হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিপুরুষ, না-হতে পেরেছে একটি পুরোপুরি যান্ত্রিক পুতুল। Albert Schweitzer যথার্থই বলেছেন: "The modern man is lost in the mass in a way which is without precedent in history, and this is perhaps the most characteristic trait in him."[১]

আধুনিক মানুষ পা চালাতে শিখেছে তাল মিলিয়ে, তাই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে গড্ডলিকা-প্রবাহে। কিন্তু মন তার মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে উঠছে, বলছে: 'ভাঙো তাল'! Mal-adjustment শব্দটার সঙ্গে এ যুগের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ। সেটা তো আর কিছুই নয়, শুধু বেতাল চরণ-ফেলার ব্যাধি। সমষ্টি-শাসিত ব্যক্তি-মানসের প্রধূমিত বিদ্রোহ, অসহনীয় নিষ্ক্রিয়তাবোধ, অন্তঃসলিলা কান্না শুনতে পাওয়া যায় বর্তমান সাহিত্যে সমাজদর্শনে। অতীন্দ্র এক পরিস্থিতিতে এবং এ যুগের মানুষ আর-এক পরিস্থিতিতে mal-adjusted ব্যক্তিমানস। দুয়ের হৃদয়বেদনার মধ্যে একটি নিবিড় আত্মীয়তা আছে। অতীন্দ্র আমাদের অতি-পরিচিত। তাই তার গুমরে-ওঠা হাহাকার যেন অনেক দিনের ব্যবধান পার হয়ে ভেসে আসে, আমাদের অবচেতনার তটে ভেঙে পড়ে, প্রতিধ্বনি জাগায়

১. *The Decay and the Restoration of Civilization*, Adam & Charles Black, 1955, p. 29

অন্তরে। অতীন্দ্র দেশাতীত কালাতীত পুরুষ।

যুগে যুগে সমাজ-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবতার যে-আদর্শ প্রকাশ্য তার দাবি শুধু একটি : মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দাও, তার বৈচিত্র্যবান ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করো, তার জিজীবিষাকে সসম্মানে মেনে নাও। এ কথা কে অস্বীকার করবে যে, মানুষের খণ্ডতা আছে খর্বতা আছে আর সেটাই মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে বেড়ায়? মানুষের দৈন্য অপ্রকাশের দৈন্য। তার হীনতা ভেদবুদ্ধি-সঞ্জাত বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ। ক্ষুদ্রতা-খর্বতার সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হবার ক্ষমতাও তার আছে। সেই ক্ষমতাই তার আত্মশক্তি। আত্মশক্তির প্রণোদনায় মানুষ অচলায়তনের দেয়াল ভাঙে, যক্ষপুরীর ধ্বজা ধুলায় ফেলে, 'দেবতার অমর মহিমা'-র অধিকার-লাভের আশায় আপন মর্তসীমা চূর্ণ করবার সাধনা করে। শক্তি-পরীক্ষার পদ্ধতির দিক থেকে এখানেই সন্ত্রাসবাদ বা ঐ-জাতীয় যান্ত্রিক জীবনবাদের সঙ্গে মানবতাবাদের দুরপনেয় বিরোধ। সন্ত্রাসবাদ জৈবিক শক্তি-সাধনায় বিশ্বাসী। মানবতাবাদের লক্ষ্য : আত্মশক্তি-বিকাশের সাধন। সন্ত্রাসবাদ মানবতা-বিমুখ, কারণ মানুষের আত্মমর্যাদা, মানুষের জিজীবিষা, মানুষের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির স্বীকৃতি নেই সন্ত্রাসবাদী জীবনদর্শনে। সহিংস বিপ্লবীর সাধনায় মন-মিলানো মহাসংগীতের সুর নেই।

জৈবিক শক্তির তুলনায় আত্মশক্তির বল কোথায়? জৈবিক শক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাকে স্থূল চোখে দেখতে পাই। কিন্তু আত্মশক্তি? তাকে কেমন করে অনুভব করব, কেমন করেই বা তার সার্থকতা হৃদয়ংগম করব? এই প্রশ্নের উত্তর মেলে রবীন্দ্রনাথের স্থিতপ্রজ্ঞ মানবিক বিশ্বাসে : "তাহা সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহিবার অপরিসীম শক্তি হউক। জগতে কাহারো সাধ্য নাই— দুঃখের শক্তিকে, ত্যাগের শক্তিকে, ধর্মের শক্তিকে বলির পশুর মতো শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে। তাহা হারিয়া জেতে, তাহা মরিয়া অমর হয়, এবং মাংসপেশী আপন জয়স্তম্ভ নির্মাণ করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পায় সে পক্ষাঘাতে অচল হইয়াছে।"[১]

১. "ছোটো ও বড়ো", কালান্তর, পৃ. ১১৩

কাহিনী

এক মানবিক জীবনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে চার অধ্যায় কাহিনীর প্রবর্তনা। চার অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল জীবনবাদ ও সাহিত্যের স্থমিত সমন্বয়, এই জীবনবাদকে তত্ত্ব নাম দিলে ভুল করা হবে। 'মানুষের ধর্ম' বা 'কালান্তর'-এ যখন তার প্রকাশ দেখি, তখন সে তত্ত্ব। কিন্তু সে যখন গোরা, ঘরে-বাইরে, চার অধ্যায় -এর ব্যক্তি-পুরুষের চরিত্র-মানসকে সঞ্জীবিত করে, তখন তাকে জীবনবাদ আখ্যা দিতে হবে। বস্তুত, তত্ত্ব এবং জীবনবাদের মধ্যে একটা বড়ো পার্থক্য আছে।

বহু-বিচিত্র জগতের বিপুল তথ্যসম্ভার মানুষের মনে জাগায় অসীম কৌতূহল, অনন্ত জিজ্ঞাসা। প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে মন যেন রক্তকরবীর রাজার মতো দাবি করে: "আমি জানতে চাই।" যা-কিছু সে দেখছে শুনছে স্পর্শ করছে, তার বোধশক্তির কাছে তারা এক বিরাট দুর্বোধ্যতার চ্যালেঞ্জ। তাদের উল্টে-পাল্টে ছিঁড়েকুটে সে বুঝতে চায় এই অগণিত তথ্যের অর্থ কী। নইলে তার বিরাম নেই স্বস্তি নেই। জানবার অদম্য আগ্রহে সে তথ্যের পর তথ্য সংগ্রহ করে চলে, থরে বিথরে তাদের সাজায় গোছায়, তাদের পারম্পর্য তাদের কার্যকারণ-সম্বন্ধ আবিষ্কার করে, বর্ণনা দিয়ে সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের এক-একটা সুবোধ্য রূপ দেবার প্রয়াস পায়। এমনি করে তথ্য-জগতের আপাতদৃষ্ট বিচ্ছিন্নতা-বৈষম্য-অসামঞ্জস্য-দুর্বোধ্যতার যখন একটা সুষ্ঠু সুসম্বদ্ধ সুসমন্বিত রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে, তখন মেধা তৃপ্ত হয়, স্বস্তি পায়। মেধার এই প্রয়াসের ফল হল তত্ত্ব। মানুষের জীবনায়নে যদি কোনো তত্ত্বের আবির্ভাব হয় যার মধ্যে মানুষের অনন্ত জিজীবিষার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়, মন তাকে আপন অন্তরলোকে ঠাঁই দেয়। সেখানে জীবনলিপ্সা ও বিশ্বাসের রঙে রসে সজীব সতেজ হয়ে তত্ত্ব তার শিকড় ছড়িয়ে দেয় চরিত্রমানসের গভীরে, শ্রেয়-প্রেয়-বোধের ফুলে পল্লবে জীবনকে সবুজ সুন্দর করে তোলে। ব্যক্তি-জীবনের আলো-ছায়ায় নূতন রূপে বিকশিত তত্ত্বের নাম জীবনবাদ— মানুষের পথ-চলার দিগ্‌নির্দেশ। তত্ত্ব নৈর্ব্যক্তিক; ব্যক্তি-পুরুষের হৃদয়বৃত্তির স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে হয় তাকে। কিন্তু জীবনবাদ মূলত ব্যক্তিক— প্রত্যেক ব্যক্তি-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আকূতির প্রাণময় প্রতীক।

ব্যক্তিমানস সাহিত্যের উপজীব্য, তাই জীবনবাদের সঙ্গে সাহিত্যের আত্মীয়তা আছে। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব সাহিত্য-এলাকার বাইরে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে, কুমারসম্ভব পড়তে বসে কেউ প্রশ্ন তোলে না সাংখ্যতত্ত্ব যথাযথ ব্যাখ্যাত হয়েছে কি না। ঠিক যেমন, "সীমার মাঝে অসীম তুমি" গানটি গাইবার সময় কেউ সেখানে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ভাষ্য খোঁজে না। Sholokov-এর Don-সিরিজের উপন্যাস সাহিত্য-দরবারে মার্ক্সবাদী রাশিয়ার অনবদ্য দান। কিন্তু তার মধ্যে যদি কেউ "Capital"-এর ভাষ্য খুঁজে বেড়ায় তাকে আর যাই বলা হোক-না কেন, রসিক বলবে না কেউই। জ্ঞানলোকে তত্ত্ব মাথার বোঝা, কিন্তু অন্তরলোকে জীবনবাদ প্রাণের ঐশ্বর্য। ব্যক্তি-পুরুষের এই ঐশ্বর্যকে সকলের অন্তরের ধন করে তুলবার কাজ সাহিত্যস্রষ্টার।

চার অধ্যায় একটি প্রেমের কাহিনী— অতীন্দ্র-এলার প্রেমের ইতিহাস। তাদের ভালোবাসায় যে-তীব্রতা যে-বেদনা ছিল, তাকে রূপ দেওয়াই আখ্যানবস্তুর উদ্দেশ্য। প্রেমের ট্র্যাজেডি যে কত বিচিত্ররূপে প্রকাশ পেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীশ-দামিনী মধুসূদন-কুমুদিনী নিখিলেশ-বিমলা শশাঙ্ক-ঊর্মিলা আদিত্য-সরলা, এমন-কি, অমিত-লাবণ্য— সকলের ভালোবাসাতেই ট্র্যাজেডির একটা-না-একটা দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রেমের ট্র্যাজেডিতে এত বৈচিত্র্য কেমন করে সম্ভব তার এক সহজ সত্য উত্তর মেলে প্রেমের বিবর্তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আখ্যানে: "নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়কনায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয়, চারি দিকের অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝর প্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষ রূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ আর-এক দিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য।"[১] প্রত্যেক প্রেমের ক্রমবিকাশে আছে এই সংরাগ ও সংবাধের দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের বিচিত্রতাই প্রেমকে নব নব বৈশিষ্ট্য দান করে। তাই প্রত্যেক প্রেমের ট্র্যাজেডি মূলে এক হলেও বিকাশে বিভিন্ন। চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে,

১. র-র ১৩, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৫৫৪

যোগাযোগ, শেষের কবিতা, মালঞ্চ, দুইবোন— প্রত্যেক কাহিনীতে এক বিশেষ সংবাধের অভিঘাতে সংরাগ এক বিশেষ রূপ নিয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রেমের ইতিহাস তাই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ও মহিমায় অভিনব। চার অধ্যায় কাহিনীতে কবি "এলা এবং অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য"কে মূর্ত করতে চেয়েছেন। সুতরাং "তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে, সেইসঙ্গেই দেখাতে হয়েছে যে-অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষ পর্যন্ত কারবার করতে হল তারও বিবরণ।"[১] এলা এবং অতীন্দ্র যার যার আপন "স্বভাবের মূলধন" নিয়ে নদীর মতো এসে পড়েছে এক বিশিষ্ট পরিস্থিতির মাঝে। সেই বিশিষ্ট পরিস্থিতি কেমন করে তাদের জীবনকে গ্রাস করে ফেলল, সেই বিরোধ কেমন করে তাদের প্রেমের বিবর্তনকে প্রভাবিত করল, তাদের ভালোবাসার স্রোতকে কোন্ মরা বালুচরের দিকে টেনে নিয়ে গেল, কেনই বা গেল এটাই কাহিনীর বক্তব্য। অতএব তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের যৌক্তিকতা ও তীব্রতা অনুভব করতে হলে তাদের "স্বভাবের মূলধনটা"কে বুঝতে হবে; এই-যে স্বভাবের মূলধন, এই-যে প্রাণের ঐশ্বর্য— এটাই হল জীবনবাদের প্রশ্ন। তাই তাদের উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীন রাহুগ্রস্ত চরিত্রমানসের মর্মোদ্ধার করতে গেলে জীবনবাদের প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। সে জয়দ্রথের মতো সাহিত্যিক মূল্যায়নের ব্যূহদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে।

চার অধ্যায়ের 'আভাস' ঘিরে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। তার কারণ চারটি এবং সব-কটাই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে জড়িয়ে। তারই মধ্য দিয়ে সহিংস রাষ্ট্রোদ্যমের মূল্যায়ন।

প্রথম কারণ: বিভীষিকা-পন্থীদের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের যোগসূত্র। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "সেই সময় দেশব্যাপী চিত্তমন্থনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারি মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিল।"

দ্বিতীয় কারণ: উপাধ্যায়ের পরিবর্তন। কবি লিখেছিলেন: "বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এত বড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।"

---

১. র-র ১৩, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৫০৪

তৃতীয় কারণ : ব্রহ্মবান্ধবের স্বীকারোক্তি। কবির ভাষায় : "এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি। মনে করেছিলুম, হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র-আন্দোলন-প্রণালীর প্রভেদ অনুভব ক'রে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।

"নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। এই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোয় তেতালার ঘরে একলা বসেছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়।... আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।' এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।"

চতুর্থ কারণ : স্বাধীনতার সহিংস আন্দোলনের ভ্রান্ত মূল্যায়ন। উপসংহারে কবি লিখেছিলেন : "উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।" ব্রহ্মবান্ধবের মতো অতীন্দ্র স্বধর্মভ্রষ্ট। নিজের কর্মজালেই সে বন্দী, নিষ্কৃতির উপায় নেই।

প্রথম কারণের বিশ্লেষণে মনে একটা প্রাথমিক প্রশ্ন জাগায় : সত্যই কি ব্রহ্মবান্ধব কোনো সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? 'যোগ' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে— আত্মিক যোগ এবং ব্যাবহারিক যোগ। যেখানে আদর্শের মিলন হয়, দৃষ্টিকোণ যেখানে একই লক্ষ্যের দিকে নিবদ্ধ সেখানে আন্তর্ব্যক্তিক সম্বন্ধকে আত্মিক যোগ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। ব্যাবহারিক অর্থে যোগ বাহিরের সংসর্গকে বোঝায়। এই দুটি অর্থ পারস্পরিক বিচ্ছিন্নও হতে পারে, আবার সংযুক্তও হতে পারে। একটি উদাহরণ : কোনো এক ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে যোগসূত্র ব্যাবহারিক : কর্ম। কর্মের মধ্য দিয়েই তাদের একত্রীকরণ। এখানে আদর্শের কথা ওঠে না। শুধু লেন-দেন— টাকার বদলে কাজ, কাজের বদলে টাকা ; ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক। এই ছবি পালটে যায় যখন কোনো সেবা-প্রতিষ্ঠান বা কোনো আদর্শ-প্রণোদিত রাজনীতিক গোষ্ঠীর কথা ওঠে। সেখানে সবাই 'এক সূত্রে বাঁধা আছে'। এটাই হল আত্মিক যোগ। আত্মিক যোগে ব্যাবহারিক অর্থ প্রযুক্ত হতেও পারে, নাও হতে পারে। যেমন, ব্যক্তি-বিশেষ এক বিশিষ্ট রাজনীতিক আদর্শে বিশ্বাসী। যদি প্রয়োজন

পড়ে সেই আদর্শকে প্রচার করতে সে পিছ-পা হয় না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাকে দলগত সভ্য হতেই হবে।

উপাধ্যায় কোনো উগ্র স্বাধীনতা-সংগ্রামী দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন কিনা সেটা প্রমাণ-সাপেক্ষ। তাঁর জীবনীকার শ্রীমনোরঞ্জন গুহ এই বিষয়ের উপর যে-মন্তব্য করেছেন সেটা প্রণিধানযোগ্য : "স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োজনবোধে হিংসার প্রয়োগ অবিধেয় নয় ব্রহ্মবান্ধব দ্বিধাহীন এই মত প্রচার করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি বাস্তবিক কোনো হিংসাত্মক গোপন কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, যদি বা কোনো এক সময়ে ঐ ধরনের একটা চিন্তা তাঁর মাথায় এসেও থাকে।"[১] তবে কেন কবি ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে এই কথা লিখেছিলেন যে দেশব্যাপী আলোড়নের মধ্যে "ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন"? তার পরেই কবি লিখলেন যে, "সন্ধ্যা" কাগজ বেরুল যার ভাষা ছিল অগ্নিবর্ষিণী। ব্রহ্মবান্ধবের লেখনী ছিল সংগ্রামীদের প্রেরণার উৎস। সেই প্রেরণার মধ্যে হিংসার ইঙ্গিত : "... যদি কেহ তোমাকে ঠেঙ্গাইতে আসে কিম্বা তোমার বে-ইজ্জৎ করিতে আসে— তা সে ফিরিঙ্গিই হউক বা তার চৌদ্দপুরুষ হউক— তাহাকে ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা দেখাইবে। ইহা বিধাতার নিয়ম, সকল নিয়মের চেয়ে বড়।"[২] উপাধ্যায়ের বিশ্বাস ছিল স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে শুধু অহিংসার পথে চললেই হবে না। শক্তির সঙ্গে যুঝতে হলে প্রয়োজন হয় শক্তিরই। সহিংস শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে সহিংস্র শক্তির আশ্রয় এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তাই ব্রহ্মবান্ধব লিখেছেন : "... পরাধীন অবস্থা সহজ অবস্থা নহে, পরাধীন অবস্থা শান্তির অবস্থা নহে। ইহা সংগ্রামের অবস্থা। এইরূপ সংগ্রামের অবস্থায় প্রেমকেও আপাতত অপ্রেমের মধ্য দিয়াই চরিতার্থতা লাভ করিতে হয়।"[৩] সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের ব্যাবহারিক যোগ ছিল না বটে, কিন্তু আত্মিক যোগ ছিল। এ কথা অনুমান করা অসংগত হবে না যে, তাঁর সংকল্প ছিল তাঁর লেখনী হতে উৎসারিত হবে এমন রচনা যা "সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে" দেবে; তবেই তাঁর

১. 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়', শিক্ষানিকেতন, বর্ধমান, পৃ. ৭০

২. তদেব, পৃ. ৬৮

৩. তদেব, পৃ. ৭০

আদর্শ রূপায়িত হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রেরণাদাতার, দলগত সঙ্ঘের নয়। তাই 'ঝাঁপিয়ে পড়া'-র অর্থ এই নয় যে, সহিংস দলের অংশ হয়ে বিভীষিকা পন্থের পথিক হয়েছিলেন। "স্বভাবে", শ্রীগুহ-র ভাষায়, "অতি উদার কোমলহৃদয় এবং ব্যক্তিগত আচরণে শ্রদ্ধাশীল মানুষ ছিলেন। নির্মমতা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সংবাদপত্রী মূর্তির যথেষ্ট অমিল ছিল।"[১] স্বভাবে যিনি কোমল উদার, কেমন করে তিনি হিংসার জয়গান করতে পারলেন? তা হলে কি উপাধ্যায় দ্বৈত ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত?

এই প্রশ্নটির পরিপ্রেক্ষিতেই দ্বিতীয় কারণের বিশ্লেষণ যুক্তিসংগত। রবীন্দ্রনাথ যে ক্যাথলিক বৈদান্তিক "তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী" ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, যাঁর অধ্যাত্মবিদ্যায় "অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে," সেই পরিচিত ব্রহ্মবান্ধব কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন, তাঁর পরিবর্তে এক 'অচেনা' ব্রহ্মবান্ধবের আবির্ভাব হল যিনি লিখতে পারলেন: "প্রেমকেও আপাতত অপ্রেমের মধ্য দিয়াই চরিতার্থতা লাভ করিতে হয়"। মানবপ্রেমীর কাছে এটা একটা "প্রকাণ্ড পরিবর্তন" বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক, সন্দেহ নেই। ব্রহ্মবান্ধবের জীবনী পড়লে একটা ধারণা স্বভাবতই জাগে যে, তিনি বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যে এক প্রহেলিকাময় ব্যক্তি। "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি": কবি-বর্ণিত এই সুদূরের পিপাসায় চঞ্চল অস্থির আত্মা যেন ব্রহ্মবান্ধবের মধ্যে দেহধারণ করেছে। শ্রীগুহ এই সদা-চঞ্চল ব্যক্তির বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন: "কিন্তু ভবানীচরণের (ব্রহ্মবান্ধবের পিতৃদত্ত নাম) বায়ুমণ্ডল কখনো বেশিদিন শান্ত থাকার কথা নয়। তাঁর ভিতরে যেন একটা ঝড়ের কারখানা ছিল, থেকে থেকে এক একটা ঝড় বেরিয়ে আসত। বাল্যকাল থেকে ৪৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ পর্যন্ত একই ব্যাপার দেখা গেছে— একটার পর একটা ঝড়ের লীলা।"[২] ব্রহ্মবান্ধব যেন বহুধা অন্বেষণের অবিরাম গতিতে চঞ্চল অস্থির। যদিও রবীন্দ্রনাথের কাছে এই চঞ্চল-অস্থির স্বভাব নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না, তা হলে এই অনুমান যুক্তি-সংগত হবে যে, কবির দৃঢ় বিশ্বাস

---

১. 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়', শিক্ষানিকেতন, বর্ধমান, পৃ. ৬০-৬১

২. তদেব, পৃ, ১৬

ছিল, উপাধ্যায় আর যাই করুন না-করুন, কোনোদিনও হিংসাকে প্রশ্রয় দেবেন না। তাই উপাধ্যায়ের সহিংস সাংবাদিকতা তাঁর মনে গভীর বেদনার মতো বেজেছিল।

তৃতীয় কারণের মূল্যায়ন করবার পূর্বে উপরি-উক্ত 'পরিবর্তন' এবং উপাধ্যায়ের 'পতন'-সূচক স্বীকারোক্তির পারস্পরিক যোগাযোগ বিশ্লেষণের প্রয়োজন। উপাধ্যায়ের চরিত্র পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্তনকে 'প্রচণ্ড' ব'লে বিশেষিত হয়, তখন শব্দটির ভাবার্থ প্রসারিত হয় এই কারণে যে, মান-মূল্যায়নের সঙ্গে সে জড়িত হয়ে পড়ে। সেণ্ট অগাস্টিন, সেণ্ট ফ্র্যান্সিস অফ অ্যাসিসি, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ: 'প্রকাণ্ড' পরিবর্তনের এমনি কত সুজনোত্তমের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। পরিবর্তন, সংকীর্ণ অর্থে, একটা জৈবিক ব্যাপার। কিন্তু পরিবর্তন 'প্রচণ্ড' হয়, যখন সে মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে। মূল্যবোধ যখন বেঠিক পথ দিয়ে চলে, সে অধোগামী হয়ে পৌঁছয় তামসিকতার রাজ্যে, যেখানে শুভবুদ্ধির, মানবতাবোধের প্রবেশ নিষেধ। যাদের মূল্যবোধ মানবতার সুরে বাঁধা, তাঁরা সুজনোত্তম। এখন প্রশ্ন: ব্রহ্মবান্ধবের 'প্রকাণ্ড' পরিবর্তন কোন্ পর্যায়ে পড়বে? তাঁর অসাধারণত্ব সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত। এবং এটাও স্বীকৃত হয়েছে যে, তাঁর সৃজনমুখী প্রতিভা অমিত-সম্ভাবনায় ভাস্বর ছিল। কিন্তু এই প্রতিভা তো কোনো সৃষ্টির কাজে লাগল না; দিগ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক ছুটে ছুটে সে নিজেকে শীর্ণ করে তুলল। এই প্রসঙ্গে শ্রীগুহের একটা মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ: "...ব্রহ্মবান্ধবের প্রকৃতি যেরূপ ছিল তাতে মনে হয় তাঁর জীবনে আর একটা বড়ো পরিবর্তন আসন্ন হয়ে এসেছিল যার প্রকাশ দেখা যেত যদি তিনি আরো কিছুকাল বাঁচতেন। কিন্তু কোন্ রূপে সেই পরিবর্তন দেখা দিত তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। কেবল এইটুকু বলা যায় যে, যে-রূপেই আসুক, বলতে হত— অপূর্ব!"[১] আর-একজন মহাপুরুষের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাঁর উদ্দেশে কবি বলেছিলেন: "লহ নমস্কার"। তিনিও ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামী। হিংসার বদলে হিংসা— এই নীতিতে তিনিও বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর জীবনেও উত্তরকালে এক 'প্রকাণ্ড' পরিবর্তন ঘটেছিল যার ফলে সেই মহাপুরুষের জীবন আত্মোপলব্ধির

১. 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়', শিক্ষানিকেতন, বর্ধমান, পৃ. ৮১

জ্যোতিতে চির-ভাস্বর হয়ে থাকবে মানবের ইতিহাসে। তাঁর জয় আত্মশক্তির জয়। ব্রহ্মবান্ধবের পরাজয় আত্মার পরাজয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কি বলা যায় না যে, যে-অপূর্ব সম্ভাবনার অস্ফুট দীপ্তি ব্রহ্মবান্ধবের ব্যক্তিত্বের গভীরে ছিল তার ইঙ্গিত কি ক্রান্তদ্রষ্টা কবির intuition-এ বা স্বজ্ঞায় ধরা পড়েছিল? পড়েছিল নিশ্চয় এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'আভাস'-এ চিত্রিত ব্রহ্মবান্ধবের চরিত্র। কিন্তু সেই অপূর্ব সম্ভাবনা প্রকাশের পূর্বেই চিরতরে মিলিয়ে গেল "বৈভীষিক রাষ্ট্রোদ্যমের" চোরাবালিতে। পরিবর্তনের ধারা মূল্যবিহীন পথ দিয়ে চলতে চলতে পৌঁছল অন্ধকারের প্রান্তদেশে : পতনের অতল গহ্বরে।

"রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে" : ব্রহ্মবান্ধবের এই স্বীকারোক্তির পিছনে তাঁর তীব্র ব্যর্থতাবোধ। তাঁর জীবন সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত জীবনেই বহু আদর্শকে গ্রহণ করেছেন বর্জন করেছেন। 'বৈদান্তিক' 'ক্যাথলিক' 'সন্ন্যাসী' যেন কোন্ একটা অনৈসর্গিক আত্মক্রান্ত সমন্বয়ের অন্বেষণে ছুটছিলেন এই আশায় যে, তিনি দেখতে পাবেন অপরূপ সাগরসংগম যেখানে সব দ্বন্দ্ব সব হিংসা-দ্বেষ লীন হয়ে যাবে এক অসীম সমগ্রতায়। জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর আদর্শকেন্দ্রিক মনোবৃত্তিগুলো (যারা ছিল তাঁর স্বভাবের মূলধন স্বধর্মের শক্তি) হারিয়ে তিনি ভাবের রাজ্যে একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁদের বন্ধুত্ব মনের মিলন হতে উদ্ভূত। তাঁর নিজের ব্যর্থতার কথা কবি ছাড়া আর কার কাছে তিনি কবুল করতে পারতেন? তাই তাঁর শেষ 'confession' ব্যক্ত হল তাঁর একান্ত সমধর্মী সুহৃদের কাছে। কবি যথার্থই লিখেছিলেন : "…এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যে তাঁর আসা।" উপাধ্যায় উপলব্ধি করেছিলেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথার মর্ম বুঝতে পারবেন।

একটা প্রশ্ন বাকি থেকে গেল : 'আভাস'-এর সঙ্গে কাহিনীকে জড়ালেন কেন? এবং, যদি জড়ালেনই তবে দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্জন করলেন কেন?

'আভাস'-এর উপজীব্য হল : একজন অমিতপ্রতিভাবান পুরুষের মর্মান্তিক পতন। চার অধ্যায়ের উপজীব্য হল : সেই মর্মান্তিক পতনের পিছনে সক্রিয় চরিত্রমানসের ঘাত-প্রতিঘাত। আত্মার পতনের কারণ একটাই ; তদনুযায়ী ফল। স্বাধীনতা এক মহান আদর্শ। তার প্রার্থনা :

"...মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে,
উদার আলোক-মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।"

—নৈবেদ্য, পৃ ৪৮

এই প্রার্থনা যতক্ষণ অন্তরের অন্তস্তল হতে উৎকীর্তিত না হয়, ততক্ষণ আদর্শ শুধু মৃন্ময় প্রাণহীন। যে-আদর্শে মানবতার প্রাণস্পন্দন নেই, তার অভিমুখে যাত্রা স্বভাবতই আঘাটায় পৌছয়। তখন অনুভবনশীল মনে অনুশোচনার অগ্নিদাহন। তাই ব্রহ্মবান্ধবের যন্ত্রণা মুখর হয়ে উঠেছে অতীন্দ্রের কথায়।

কবি তাঁর স্বজ্ঞায় অনুভব করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধবের যন্ত্রণা : এটাই যদি সত্য হয়, তবে 'আভাস'-বর্জন কবির দুর্বলতার লক্ষণ। জনমত তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে এবং সেটাই কবি মেনে নিয়েছেন। অভিযোগ উঠেছিল, ব্রহ্মবান্ধব তথা অতীন্দ্রের মাধ্যমে সহিংস আন্দোলনের যাঁরা শহিদ কবি তাঁদেরই বিরূপ এবং ভ্রান্ত মূল্যায়ন করেছেন। এই বিদ্বেষী প্রতিক্রিয়ার ফলে লোকচক্ষে 'আভাস'-এর গুরুত্বহীনতা প্রমাণ করবার জন্য ওটা একেবারেই বর্জন করলেন।

এই যদি পাঠকমহলের অভিমত হয় তবে দুঃখের কথা। কারণ, পাঠকমহল বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকে চিনতে ভুল করেছেন। কবির ব্যক্তিত্ব ছিল বলিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, অনমনীয়। এই অনমনীয় ব্যক্তিত্বের অন্য একটা দিক আছে, যেটার কথা সবাই জানেন বোধ হয়। সেই দিকটা প্রীতি-শ্রদ্ধা-বন্ধুত্ব-কৃতজ্ঞতায় স্নিগ্ধ। ব্রহ্মবান্ধব কবির শুধু সহকর্মীই ছিলেন না, তাঁদের সাহচর্য ছিল আত্মিক। তাই কবি লিখেছিলেন : "শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার সহযোগী পাই। এই উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।" একটি প্রশ্ন কেবলই মনে ঘা দেয়, এমন আত্মিক মিলন যেখানে সেখানে কি কবি বলতে পারতেন যে, তাঁর একদা-সহযোগী-বন্ধুর 'পতন' হয়েছে? মনে হয় না সেটা স্বাভাবিক। বরং বিপরীত দিকটাই সম্ভবত সত্য। কবি যখনই দেখলেন পাঠকমহল "পতন" শব্দটি ব্যাবহারিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং কবিকেই দোষ দিলেন ব্রহ্মবান্ধবকে "হেয়" প্রতিপন্ন করবার জন্য, তখন কি কবির মনে কোনো বেদনা জাগে নি? রবীন্দ্রনাথ বিরূপ

সমালোচনায় বিচলিত হতেন না। জনপ্রিয়তা অর্জন করবার জন্য তিনি আপনার রচনা থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ কেটে-ছেঁটে দিয়েছেন এমন নজির, যতদূর জানা আছে, রবীন্দ্ররচনায় বিরল। এই পরিস্থিতিতে যেটা অনুমান করা অসংগত হবে না সেটা হল : কবি বেদনাহত হয়েছিলেন যখন দেখলেন তাঁরই লেখনী দিয়ে তাঁরই ঘনিষ্ঠ প্রয়াত বন্ধুকে জনচক্ষে "হেয়" করেছেন। কারণবিহীন বর্জনের কারণ এই যে, এটা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সেইজন্য কারণের কোনো স্পষ্ট আভাস দেন নি কোথাও।

স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে প্রতিভাত হবে, "আভাস" কাহিনীর অন্তর্নিহিত আত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করার পথে অন্তরায় হয় না, বরং সহায় হয়। ব্রহ্মবান্ধবের স্বীকারোক্তি যেন ব্যক্তিমানসের ইতিহাসে এক সকরুণ অভিজ্ঞতার শিরোনামা। তার মাঝে বাজে গভীর বেদনাবোধ ও আত্মগ্লানির রেশ। এই গ্লানিবোধের কারণ কী হতে পারে, দরদী মন নিয়ে কবি তার বিশ্লেষণ করেছেন অতীন্দ্র-চরিত্রে। যে-অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের আত্মগ্লানির কারণ হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি যে-কোনো দরদী মানবধর্মীর মনে অনুরূপ অনুভূতির আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে স্বীকার ক'রে নিলে চার অধ্যায় কাহিনীর রসাস্বাদন সহজ হয়ে উঠবে। মূল বক্তব্য হল এই যে, যদি কোনো জীবনবাদ চরিত্রের মূল সত্যকে অস্বীকার করে, তার মানবিক সত্তাকে উপেক্ষা ক'রে তাকে দল গোষ্ঠী বা সমাজের একটি জৈবিক ইউনিট মাত্র বানিয়ে ফেলে, যদি তাকে এমন পথে চলতে বাধ্য করে যে-পথে তার নিজস্ব জীবনবাদ প্রতি পলে বিপর্যস্ত, তবে সেই প্রতিকূল জীবনবাদের সঙ্গে মানবতাবাদীর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। এমন সংঘর্ষ যখন ঘটে, মানবধর্মী চরিত্র হয় রঞ্জনের মতো হাসিমুখে রক্তকরবীর গুচ্ছ নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়ায়, ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো "পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়", নিখিলেশের মতো উন্মত্ত জনতার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে— নয়তো ব্রহ্মবান্ধব এবং অতীন্দ্রের মতো স্বভাব-ভ্রংশনের দুঃসহ আত্মগ্লানিতে পুড়ে মরে অনুদিন অনুখন।

কাহিনীর নায়ক নায়িকা অতীন্দ্র এবং এলা। নায়িকার পরিচয় দেবার ভার কবি নিজেই নিয়েছেন। তাই এলার আবাল্য জীবনকাহিনী এবং ব্যক্তিত্বের বর্ণনা সযত্নে বিবৃত হয়েছে আখ্যায়িকার ভূমিকায়। কিন্তু অতীন্দ্রনাথের আত্ম-

পরিচিতি স্বমুখনিঃসৃত। এটা বোধ হয় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ। অতীন্দ্র কথা বলতে ভালোবাসে। একদা "কথার টর্নেডো দিয়ে সনাতন মূঢ়তার ভিত" ভাঙবার পণ করেছিল সে। এই বাক্‌প্রীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অহংকার যাকে তার "স্বভাবের সর্বপ্রধান সদ্‌গুণ" ব'লে নিজেই পরিহাস করেছে। ক্ষুরধার বিশ্লেষণে অতীন্দ্রের আনন্দ। এলা, দল, সহকর্মী, নিজে— কেউই সে বিশ্লেষণের কাটাছেঁড়ার বাইরে পড়ে নি। তার চিত্রধর্মী সাহিত্যপ্রতিভা কথার তুলি দিয়ে নিরন্তর ছবি এঁকেছে আপন অন্তরের ভালোবাসার, আশা-নিরাশার। অতীন্দ্র যেন এক অস্থির অগ্নিশিখা— অবিরাম গতি, শান্তিহীন অন্তর্দাহন; উর্ধ্বে যাবার পথ বন্ধ তাই নিজের চারি দিকে ঘুরে ঘুরে মরছে অশান্ত অন্তরাবেগে। সেইজন্য আমরা দেখতে পাই আপন দোষত্রুটি নিয়ে গর্ব করছে, নিষ্ফল ভালোবাসার বেদনায় গুমরে মরছে, স্বভাব-ভ্রংশনের গ্লানিতে আত্মধিক্কারের চিতা সাজিয়ে জ্বলছে। তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন এক পাগলাঝোরা, অন্ধকার গুহার মধ্যে বন্দী হয়ে চারি দিকের দেয়ালের উপর মাথা ঠুকে মরছে অসম্ভাব্য মুক্তির মর্মান্তিক নিরাশায়। এক দিকে দুরন্ত বিদ্রোহ, আর-এক দিকে গ্লানিময় সমাপ্তির অনিবার্যতাবোধ— এই দুয়ের সংঘর্ষে যে আগুন জ্বলে ওঠে তার আভা অতীন্দ্রের পুরুষকারকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এক ক্ষতবিক্ষত বন্দী আত্মা সে। যেন এক নূতন Prometheus Bound। কিন্তু বন্ধন বাহিরের নয়। যদি হত, তাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবার শক্তি ছিল অতীন্দ্রের পৌরুষের। বন্ধন তার অন্তরে, তার ব্যক্তি-মানসের মাঝে, তার সংকল্পের শুচিবোধে, আত্মসম্মানের দৃঢ়তায়। স্বভাবকে সে নষ্ট করেছে, কিন্তু সে যেন তার স্বভাবরক্ষার প্রণোদনাতেই। এই অন্তর্বিরোধ অতীন্দ্র-চরিত্রের একটি অতি-বিশিষ্ট লক্ষণ।

অতীন্দ্রের মুখর ব্যক্তিত্বের কাছে এলা যেন মৌনম্লান। প্রশ্ন জাগে, এলা কি অশরীরী ছায়া— সে কি শুধু অতীন্দ্রের মতামতের একটা ক্ষীণকণ্ঠ-প্রতিবাদ? সমালোচক-মহলে এমন কথা শোনা গেছে যে, এলা শুধু একটা আইডিয়া মাত্র, অতীন্দ্রের আদর্শবাদী বিশ্লেষণী প্রতিভার প্রকাশ-কল্পেই তার উপস্থাপনা। এলার কথাবার্তায় তার ব্যক্তিত্ব মূর্ত হয়ে ওঠে নি; শুধু কতকগুলো অভিমত ব্যক্ত হয়েছে; এটাও কোনো কোনো সমালোচকের ধারণা। সে যেন রক্তে-মাংসে-গড়া নারী নয়, কেবল নারীত্বের রূপহীন লাবণ্যের আভাস।

এই মতামত যুক্তিসংগত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এলার জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, তার চারিত্রিক ক্রমবিকাশ এক বিশিষ্ট ধারা বেয়ে চলে এসেছে। সেই ধারা ধোঁয়াটে তো নয়ই, বরং রঙে রসে রেখায় সুস্পষ্ট। মনস্তত্ত্বের গূঢ় সূক্ষ্ম নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায় তার কাজে কথায় চিন্তায়। এমন-কি, যে-জায়গায় এসে তার জীবনায়নের মোড় ঘুরল, সেখানেও মনস্তাত্ত্বিক অঙ্গুলি-সংকেত সুনির্দিষ্ট। তার জীবনের সব চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হল : প্রেমের আবির্ভাব। আবাল্য-সঞ্চিত সংস্কার, আত্মসৃষ্ট বাধা— সব ভেঙেচুরে গেল সেই আবির্ভাবের আকস্মিকতায়। সংস্কার এবং প্রেমের দ্বন্দ্বে উদ্‌ভ্রান্ত এলা যখন জীবনের শেষ সীমানায় পৌঁছল তখন তার আত্মোপলব্ধি পরিপূর্ণতা পেল। ক্ষণিক সে মুহূর্তটুকু। কিন্তু সেই ক্ষণিক মুহূর্ত যেন অনন্ত হয়ে উঠল তার জীবনে যখন সে জেনে গেল এবং জানিয়েও যেতে পারল : সে নারী। তার অন্তর্বেদনার মধ্যে এক দুর্লভ মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম মূর্ত হয়ে উঠেছে। তার সম্বন্ধে মন তাই বলে উঠতে চায় :

“দুরাকাঙ্ক্ষার পরপারে   বিরহতীর্থে করে বাস
যেথা জ্বলে ক্ষুব্ধ হোমাগ্নিশিখায়   চিরনৈরাশ—
তৃষ্ণাদাহনমুক্ত   অনুদিন অমলিন রয়।
গৌরব তার অক্ষয় ॥”

—গীতবিতান, পৃ. ৩৫৫

এলা এবং অতীন্দ্রের ব্যক্তিত্বে অনেকখানি মিল আছে। থাকাই স্বাভাবিক। পরস্পরকে তাই তারা নিবিড় করে আকর্ষণ করেছে। আবার অমিলের পরিমাণও কম নয়। সেইজন্য তাদের প্রেমের মাঝে সংঘাত আছে, আছে সমর্পণ। দুই-ই প্রকাশ পেয়েছে পাশাপাশি বিষণ্ণ-সুন্দর মাধুর্যে। দুজনেই উচ্চ-শিক্ষিত, বুদ্ধি-অভিমানী। দুজনের চরিত্রেই স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। উভয়েই সাহিত্যধর্মী। উভয়েই অন্যায়-অসহিষ্ণু নীতি-নিষ্ঠ শুচি-প্রিয় সংকল্প-সাধক। চারিত্রিক গঠনের এই সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দুস্তর ব্যবধান, যার ফলে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। যদিও অতীন্দ্রের বাল্যজীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না ; তবু এটা অনুমান করা অসংগত হবে না যে, তার পারিবারিক পরিবেশে এলার জীবনের অঘটনগুলো

ঘটে নি। সুতরাং যে-সংস্কারগুলো এলার অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্জাত হয়েছে, অভিজ্ঞতার আলোয় যেগুলি সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে, এলার সেই সংস্কারগুলি অতীন্দ্রের কাছে অদ্ভুত অযৌক্তিক অধার্মিক বলে প্রতীত হয়। এলার জীবনে ট্র্যাজেডির মূলে আছে এই আবাল্য-অর্জিত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সংস্কারগুলির দ্যোতনা। অন্য দিকে অতীন্দ্রের জীবনে ট্র্যাজেডি এনেছে তার স্বধর্মাশ্রয়ী অনমনীয় আত্মাভিমান। নারীর জীবনে সংস্কারের প্রভাব প্রবল। পুরুষের কাছে স্বধর্ম-সাধনের আকাঙ্ক্ষা দুর্বার।

এলা অতীন্দ্র ছাড়া আর-একটি ধ্রুপদী চরিত্র আছে। ইন্দ্রনাথ— বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা, সকলের মাস্টারমশায়। নেতৃজনোচিত গুণের আধার বলে পুতুলনাচের সব দড়িগুলোই তার হাতে বাঁধা। তার সাক্ষাৎ আমরা স্বল্পই পাই। কিন্তু সেই স্বল্প পরিচয়েই আমাদের মনে ইন্দ্রনাথ এক ঋজু লৌহকঠিন বলিষ্ঠ নির্মোহ পুরুষকারের ছাপ রেখে যায়। সে যেন মধ্যাহ্ন-সূর্য।

এদের সঙ্গে আছে কানাই গুপ্ত। সে একাধারে ইন্দ্রনাথের "প্রধান মন্ত্রী" ও দলের "রসদজোগানদার"। পুলিসের কুদৃষ্টি পড়েছিল তার উপর। সরকারি কোপ এড়াবার জন্য সরাসরি সে সরকারি "কানাকানি-বিভাগের" গোয়েন্দার তালিকায় নাম লিখিয়ে নিল, কারণ "নিমতলা ঘাটের রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই যাদের সামনে, তাদের পক্ষে এটা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, দেশের বুকের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বরাবর লম্বমান" (পৃ. ৭২)। সে নিঃসংকোচে স্বীকার করে: "যে শিকার জালে পড়েইছে আমি তার ফাঁস টেনে দিই" (পৃ. ৭২)। দলের যারা আপনি ঝরে পড়ে, তাদের "ঝেঁটিয়ে ফেলে পুলিসের পাঁশতলায়"। এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা গর্হিত, কিন্তু কানাই-এর কাছে নিষ্পাপ। ঘোরতর অকাল্পনিক প্র্যাক্‌টিকাল লোক সে, দু'কূল রক্ষা করে চলাই তার লক্ষ্য। Informer-জাতীয় লোকের ভাগ্যে সহানুভূতি কদাচিৎ জোটে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কানাই প্রথম থেকেই পাঠক-মনের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলে। তার কারণ সে মূলত একজন মরমী মানুষ। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তার কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলির শুকিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অনেকটা গেছেও। তবু যেটুকু বাকি আছে, তাতেই তার মনুষ্যত্বের পরিচয়। কানাইয়ের কথাবার্তায় দৃষ্টিভঙ্গিতে cynicism-এর বিচ্ছুরণ দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু

সেটা যেন বাহ্য। মানুষের দুর্বল দিকটাকে সে ভালো করেই জানে, জানে কোথায় তারা ছোটো। তবু মানুষকে সে ভালোবাসে, কোনো প্রতিদানের আশায় নয়, নিছক ভালোবাসার দায়ে। এক স্নেহশীল ঔদার্য তার চরিত্রে জাগিয়ে তুলেছে বন্ধুতার ক্ষেমংকর প্রবণতা। তাই সে আমাদের প্রিয় হয়ে ওঠে নিমেষেই। তাকে আমরা মাত্র দুবার দেখি। কিন্তু এই ক্ষণিক পরিচয়ের অতি-সীমিত পরিসরের মধ্যেই সে প্রমাণ করে যায়, ভরা-ডুবি মানুষের জন্য তার অফুরন্ত সহানুভূতি। চার অধ্যায়ের গুমোট অন্ধকারে কানাই গুপ্ত একমাত্র আলোক-রন্ধ্র।

এরা চারজন ছাড়া আরো একটি মানুষ আছে যে শুধু একবার মাত্র দেখা দেয়, তার পর নেপথ্যে বসে শেষ পরিণামের মর্মান্তিক ঘুঁটি চালে। সে বটু। এলার কাছেই তার যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায় : "ওর একটা ভিতরকার চেহারা দেখতে পাই কুৎসিত অক্টোপস জন্তুর মতো। মনে হয় ও আপনার অন্তর থেকে আটটা চটচটে পা বের করে আমাকে একদিন অসম্মানে ঘিরে ফেলবে— কেবলই তারই চক্রান্ত করছে" (পৃ. ৬৭)। বটু এক কামুক চরিত্র যার "স্বভাবে অনেকখানি মাংস, অনেকখানি ক্লেদ।" এলার দিকে তার লালায়িত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আত্মবিস্মৃত দুরাশায়। তাই প্রত্যাখ্যানের অপমান তাকে সর্বনাশ ঘটাবার পথে টানে। ভোগের জিনিস থেকে বঞ্চিত হল বলে বিশ্বাসঘাতকতা করতে তার বাধল না কোথাও। মাংস-প্রধান চরিত্রে ভোগলিপ্সা দুর্বার, পাওয়ার নেশা অদম্য, ঈর্ষা সহজাত। না-পাওয়া জিনিসকে ভেঙে ফেলায় তাদের জান্তব উল্লাস। দু-চারটি রেখা মাত্র। কিন্তু তাতেই বটু-চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে। তার লালসার স্পর্শ শুধু এলাই অনুভব করে তা নয়, পাঠকও এড়িয়ে যেতে পারে না।

এলা

এক অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে এলার বাল্যজীবন কেটেছে। মাতৃস্নেহহীন পরিবেশে উৎপীড়নের ভিতর দিয়ে সে বড়ো হয়ে উঠেছে। আর, সেই উৎপীড়ন এসেছে মায়ের দিক থেকেই। যেটুকু ভালোবাসা তার ভাগ্যে জুটেছিল, সে বাবার ভালোবাসা। নরেশ দাশগুপ্ত পণ্ডিত মানুষ। জ্ঞানপ্রীতির সঙ্গে সাংসারিক সাফল্যের যে একটা বিরোধ আছে, তাঁর জীবন সেই সত্যের উদাহরণ। সাংসারিক উন্নতির দিকে তাঁর লোভ যেমন কম, তেমনি কম সে-সম্বন্ধে তাঁর দক্ষতা। তিনি মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকতেন। নরেশবাবুর এই বিশ্বাস-প্রবণ সহনশীলতা ও ঔদার্যের ঠিক বিপরীত হল স্ত্রী মায়াময়ীর বেহিসেবি মেজাজ এবং সন্দেহবাতিক-গ্রস্ত তোষামোদ-প্রিয় প্রকৃতি। অকারণে সন্দেহ করা এবং অন্যায় শাস্তি দেওয়া মায়াময়ীর স্বভাব। আশ্রিত অন্নজীবীদের তোষামোদে পুষ্ট তাঁর প্রভুত্ববোধ এবং অহমিকার মোহ। যে-ঔদার্যগুণে বাবার প্রতি এলার একটা সদা-ব্যথিত স্নেহ, একটা নিত্য-জাগরূক প্রশ্রয়শীল অভিভাবকত্ববোধ জন্মেছিল, সেটাই মায়াময়ীর কাছে ক্ষমাহীন ত্রুটি। এই ত্রুটির জন্য স্বামীকেও খোঁটা দিতে তিনি কার্পণ্য করতেন না। তাঁর কলহে ইঙ্গিত থাকত সুস্পষ্ট যে, স্বামীর চেয়ে সে বুদ্ধি-বিবেচনায় বড়ো। পিতামাতার চারিত্রিক বৈষম্য এলার চরিত্র-গঠনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই অনুমান করা অসংগত হবে না। বস্তুত, নারী-পুরুষ সম্বন্ধে উত্তরকালে এলার যে-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়, তার সূত্রপাত এখানেই। পুরুষদের প্রতি তার সস্নেহ প্রশ্রয়োন্মুখতার উৎস হচ্ছে উপদ্রুত উদার-চরিত বাবার জীবন। পরে যখন সে কাকার আশ্রয়ে এল, সেখানেও সেই একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। মেয়েদের সংকীর্ণচিত্ততা এবং পুরুষের উদারতা বার বার তার অভিজ্ঞতায় গভীর ছাপ রেখে গেছে। তাই এলার মুখ থেকে শুনতে পাই : "অনেক দেখেছি ইতর নোংরা নিন্দুক, অনেক দেখেছি কৃপণ কুৎসিত। সব বাদ দিয়ে সব মেনে নিয়ে তবু অনেক বাকি থাকে। সেই বাকিদেরই দেখেছি উজ্জ্বল আলোয়" (পৃ. ৫৬)। যাদের জন্য এই প্রশস্তি তারা তার বাবা এবং কাকার উত্তরাধিকারী।

কবি তাঁর মানসকন্যার জীবনের সূচনা দেখেছেন বিদ্রোহের মধ্যে। মায়ের কাছে বাবার অসম্মান যেমন তাকে নরেশবাবু সম্বন্ধে স্নেহাতুর করে তুলেছিল, তেমনি তাঁর "...অতিমাত্র ধৈর্য অন্যায় বলে এলা অনেক সময় তার বাবাকে মনে মনে অপরাধী না করে থাকতে পারে নি" (পৃ. ৭)। অন্যায় চুপ করে সয়ে যাওয়াই অন্যায়, এ কথা বাবাকে বোঝাতে সে চেষ্টা করত। অন্যায়ের অপ্রতিহত প্রকাশ দেখে সে অন্যায়-অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। শান্ত-প্রকৃতি নরেশবাবু যা করতে ভালোবাসতেন না, এলা সেটাই করত : বিদ্রোহ করত, অন্যায়টাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাত। মায়াময়ীর কাছে এটা দুঃসহ স্পর্ধা, সুতরাং অমার্জনীয় শাস্তি-যোগ্য অপরাধ। কিন্তু অসংগত শাস্তির ভয় এলার সত্যবাদিতাকে তার অন্যায় বিরোধিতাকে দমাতে পারে নি কোনোদিনও। বরং অবিচারের বিরুদ্ধে তার অসহিষ্ণু প্রতিবাদ ভিতরে ভিতরে তুষের আগুনের মতো জ্বলত। আপন সংসারে প্রতিকারের কোনো পথ ছিল না। পিতৃস্নেহ, গভীর হলেও, প্রতিকারের সন্ধান দেবার মতো সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি।

মানুষের বাল্যজীবনে স্নেহভালোবাসার গভীর প্রয়োজন। কিন্তু ভালোবাসার উন্মুখ আশা যখন প্রতিহত হয়, তখন ক্ষেত্রবিশেষে ভালোবাসার জাল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার একটা দুর্বার স্পৃহা জাগা অসম্ভব নয়। এটা স্বভাবসিদ্ধ প্রতিক্রিয়া। অন্যের ভালোবাসা নইলে আমার চলবে না : এই উপলব্ধির মধ্যে একটা অসহায়তাবোধ আছে, আর আছে নিরাশ হবার সুপ্ত সম্ভাবনা। এটা যেন আত্মবিলোপের পথ। নিজেকে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত রেখে ; আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে বেঁচে থাকা : এটা স্নেহবঞ্চিতদের স্বাতন্ত্র্য লিপ্সার উৎস। তাই নির্বন্ধন আত্মনির্ভর জীবনের প্রতি এলার আকর্ষণ।

এলার মুক্তিপ্রিয়তার দুটো দিক লক্ষ করা যায়। এক দিকে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু প্রতিবাদ— শুধু নিজের হয়ে নয়, অন্যের হয়েও। আর-এক দিকে বন্ধনহীন স্বাতন্ত্র্যের সাধনা। প্রথমটা তাকে টেনে নিয়ে এল রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আবর্তে। দ্বিতীয়টি মাথা তুলে দাঁড়াল তার এবং অতীন্দ্রের মাঝখানে।

ইন্দ্রনাথের আন্দোলনে যোগ দেওয়া এলার জীবনে আকস্মিক নয়। তার মন যেন তৈরি হয়ে উঠছিল অনেক দিন ধরে। এলা তখন তার কাকা সুরেশবাবুর আশ্রয়ে। সেখানে থাকতে থাকতে এলা "স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, সে তার কাকার

স্নেহের সঙ্গে কাকার সংসারের দ্বন্দ্ব ঘটাতে বসেছে।" এমন বিষাক্ত পরিস্থিতির কবল থেকে মুক্তি তার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। মুক্তির একটা পথ অবশ্য খোলা ছিল : বিবাহ। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে এলার একটা বদ্ধমূল বৈরূপ্য গড়ে উঠেছিল গোড়া থেকেই। কন্যার চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ দেখে এলার বিবাহ সম্পর্কে মায়াময়ী শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিবাহ : এ দুটো যে সহবাসী হতে পারে না মায়ের চরিত্র দেখেই এলা এটা স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল। বিবাহ আত্মসম্মানকে পঙ্গু করে, ন্যায়বোধকে অসাড় করে দেয় : এই ধারণা এলার মনে একটা স্বাভাবিক সত্য হিসেবে ঠাঁই পেয়েছিল। তাই সে বিবাহ-বিমুখ। সুতরাং ইন্দ্রনাথ যখন তাকে ডাক দিল দেশের কাজে, পথ বেছে নিতে তার দেরি হল না। সংসারে বীতস্পৃহা যখন তার তীব্র হয়ে উঠেছে তখন ঐ অসাধারণ মানুষটির মুখ হতে এলা শুনল : "তুমি নবযুগের দূতী, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে" (পৃ. ১৩)। এত বড়ো সম্মানের যোগ্যতা তার আছে কি না সে বিষয়ে সন্দিগ্ধ হলেও ইন্দ্রনাথের আহ্বান তাকে এক নূতন উদ্দীপনা জোগাল। দেশসেবার গুরুভার গ্রহণের জন্য যে অঙ্গীকার তাকে করতে হল সেটা এলার কাছে কিছুই কঠিন নয়। ইন্দ্রনাথ শুধু চাইল, এলা যেন কখনো সংসার বন্ধনে জড়িয়ে না পড়ে : "তুমি সমাজের নও, তুমি দেশের।" সংসার-বিরোধী যার মন, বন্ধনবিরূপ যার চরিত্র, সংসার-বিলগ্ন হবার সম্ভাবনা কখনোই তার ক্ষেত্রে ঘটবে না। এলার এই আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় ছিল। দেশসেবার মধ্য দিয়ে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ পেল সে। সেইসঙ্গে পূর্ণ হল তার সংসার-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তাই অকুণ্ঠিত আত্মদানের প্রতিজ্ঞায় তার কোনো দ্বিধাই দেখা দিল না। রাষ্ট্র-বিপ্লবের পটভূমিকায় এক বিদ্রোহী আত্মা যেন খুঁজে পেল আদর্শ-প্রাণিত জীবনের পথ। এও বিধাতার এক পরিহাস। বন্ধনবিরূপ মন আপনার অজ্ঞাতসারেই সংকল্পের বন্ধনে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল।

পাঁচ বছর বাদে যখন কাহিনীর যবনিকা উঠল তখন দেখা যায় সেই বন্ধনটাই এলাকে সংশয়প্রবণ দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছে। জীবনায়ন বেছে নেওয়ায় ভুল হয়েছে কিনা, এই প্রশ্নে সে তখন বিচলিত। পাঁচটা বছর যেন এলার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। পরিবর্তনের কারণ স্পষ্টতই ভালোবাসা।

আপন স্বভাব সম্বন্ধে যে-ধারণা এলার মনে গড়ে উঠেছিল সেখানে নারীসুলভ

ভালোবাসার ঠাঁই ছিল না। ভালোবাসা আনে হৃদয়-দৌর্বল্য। আর সেটাই হল বন্ধনের বীজ। আপন শক্তির উপরে তার আস্থা অটল। তাই সে কখনো ভাবে নি ভালোবাসার বন্ধনে সে কোনোদিন বন্দী হবে। মন বিচলিত হবার মতো ঘটনা তার জীবনে যে ঘটে নি তা নয়। "কিন্তু চঞ্চলতা জয় করে খুশি হয়েছি নিজের শক্তির গর্বে" (পৃ. ৪৯)। এ কথা এলা অতীন্দ্রের কাছে কবুল করেছে। আত্মবিচলনকে কখনোই সে আত্মনিবেদনের পর্যায়ে এনে ফেলে নি, কারণ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো দুর্বল মেয়ে সে নয়। তাই বলে তো আর এ কথা বলা চলে না যে, তার অবচেতনায় কোনো দোসরের কল্পরূপ রঙে রসে রচিত হয় নি। হয়েছিল বলেই তার জীবনে অতীন্দ্রের আকস্মিক আবির্ভাব এমন বৈপ্লবিক। প্রথম দর্শনেই এলা যেন "অতি বিপুল ব্যাকুলতায়" জেগে উঠল। "এক চমকের চিরপরিচয়" ঘটল তার হঠাৎ-পাওয়া দোসরের সঙ্গে। প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে এলা অতীন্দ্রের কাছে স্বীকার করেছে, "ওগো, কতবার বলেছি— অনেকক্ষণ ধরে ডেকের কোণে বসে তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম আর-কেউ সেটা লক্ষ করছে কি না। জীবনে সেই আমার সব চেয়ে আশ্চর্য এক চমকের চিরপরিচয়" (পৃ. ৪৮)। হঠাৎ-পাওয়ার এই চমক যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ। এলার মতো আত্মস্থকেও দিশাহারা করে দিয়েছিল।

স্বাধীনচেতা মনস্বিনী ধীমতী আত্মনির্ভরা এলা: তার জীবনে যে-পুরুষ আসবে সে কখনোই সাধারণের কোঠায় পড়তে পারে না। এলার প্রাণে অতীন্দ্রের অসাধারণত্ব প্রথম দেখার দিনেই সাড়া জাগিয়েছিল। তাই সেদিন এলার "মন বললে, কোথা থেকে এল এই অতিদূর জাতের মানুষটি, চার দিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শ্যাওলার মধ্যে শতদল পদ্ম" (পৃ. ৪৮)। এলার কাছে অতীন্দ্র এমন পুরুষ যার সম্বন্ধে বলা চলে: 'লাখে না মিলল এক'। এই দুর্লভ অসামান্য মানুষটি শুধু যে জীবনে প্রাণস্পন্দন জাগিয়েই ক্ষান্ত হন তা নয়, সে যেন

> "দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয়
> চিরাভ্যাসের মেলা।"
>
> —"বোধন", মহুয়া,

"নারীজাতির গুমোর ভেঙে" এলা অতীন্দ্রের কাছে অকপটে স্বীকার করেছে : "একটা মন্ত্রপড়া বেড়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র মন উৎসুক হয়ে উঠল, বললে, ভাঙুক সব বেড়া। এমন বিপ্লব ঘটতে পারে সে কথা কোনোদিন ভাবতে পারি নি" (পৃ. ৪৯)। এখানেই এলার নবজন্ম।

প্রেমের অনুভূতি বৈপ্লবিক। আত্ম-অপরিচিত আড়াল ভেঙে সে অন্তরতম সত্যকে আবিষ্কার করে, জাগিয়ে তোলে। অতীন্দ্রের ভিতর দিয়ে এলার জীবনে সেই জাগরণ এল বটে কিন্তু আবাল্য-সঞ্চিত সংস্কার-ধারণা-বিশ্বাসের ঘুম-পাড়ানো ঘোর কাটল না সহজে। নারী-ধর্মের জয় তখনো সুদূর-পরাহত।

অতীন্দ্র এবং এলার চরিত্র রচনায় একটি বিশেষ প্রভেদ চোখে পড়ে। এলা-চরিত্রের গতি এগিয়ে চলায়। অতীন্দ্র-চরিত্রের গতি বৃত্তাকার। যে-এলাকে আমরা শুরুতে দেখতে পাই, অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তার নবজন্মের উন্মেষ দেখিয়ে কাহিনী সমে পৌঁছয়। কিন্তু অতীন্দ্র যেন আরম্ভেই পূর্ণ উন্মেষিত। তার চিত্তবৃত্তির ক্রমবিকাশের কোনো পথ নেই : অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে শুধু কেটে-ছিঁড়ে পর্যবেক্ষণ করা। তাই তিনটি অধ্যায় জুড়ে ত্রিপদী পরিক্রমণ। কিন্তু এলা প্রতিটি অধ্যায়ের ধাপে ধাপে নূতন প্রকাশের দিকে এগিয়ে চলে।

এলা-চরিত্রের ক্রমবিকাশে তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তর নির্ণয় করা যায়। প্রথমে, এলার কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আপসের পথ খুঁজছে। দ্বিতীয় স্তরে, তার কর্তব্য হার মানে প্রেমের কাছে। তখন রুদ্ধদ্বার মিলনের সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ম্বরা এলার যেন এক সকরুণ প্রার্থনা : "খোলো খোলো দ্বার"। তৃতীয় স্তরে আত্মনিষেধের 'প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত' নারী-সত্তার উদ্‌বেল প্রকাশ।

ইন্দ্রনাথের দাবি এলার কর্তব্যবোধের কাছে; কিন্তু অতীন্দ্র দাবি করেছে তার ভালোবাসা। এ দুটো কি এতই পরস্পরবিরোধী যে, তাদের পক্ষে সহাবস্থান একেবারেই অসম্ভব? সব ক্ষেত্রে না হলেও ঘটনাচক্রে এলার জীবনে তাই ঘটেছে। এলা দেশ-সেবার যে-ব্রত গ্রহণ করেছে তার কাছে প্রেম একটা হৃদয়দৌর্বল্য মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেম এক নির্দিষ্ট সীমিত পরিসরের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্তই তাকে সহ্য করা চলে। মাত্রা ছাড়ালেই সে ছোঁয়াচে রোগের সামিল হয়ে পড়ে। এমন আদর্শের মধ্যে নিষ্ঠুরতার রক্তচক্ষু দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই নিষ্ঠুরতার উপর কর্তব্যের সীলমোহর আঁকা।

উমার প্রেমে গলদ কোথায় সে কথা বোঝাতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ যখন তার "নিষ্ঠুরের সাধনা"-র ব্যাখ্যা করে, তখন সত্যনিষ্ঠ এলা প্রকাশ করতে বাধ্য হয় সে-ও ভালোবেসেছে: "আপনার কাছে মিথ্যে বলব না, বুঝতে পারছি আমার ভালোবাসা দিনে দিনেই অন্য সকল ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে" (পৃ. ২৬)। একমনা হয়ে কাজ করবার অঙ্গীকার করেছিল এলা। তখন তার মনে ছিল অজ্ঞাতির ঘন কুয়াশা। এখন মন তার নিজেকে চিনতে পেরেছে। তার বুকের ভিতরে যে পূর্ণিমা লুকানো ছিল, তাকে সে দেখতে পেয়েছে; এখন সে অমৃতের প্রাণভরা নিশ্বাস নিতে চায় অতীন্দ্রের প্রবল প্রেম হতে। তাই তার পণ-পালনে দ্বিধা-দৈন্যের আবির্ভাব। দলের চোখে উমার ভালোবাসা যদি হৃদয়-দৌর্বল্যের অপরাধ হয়ে থাকে তবে এলাও অপরাধিনী। সুতরাং তার পক্ষেও দলের সংস্রব ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। তাই ইন্দ্রনাথের কাছে তার মুক্তির আবেদন। কিন্তু ইন্দ্রনাথের চোখে উমা আর এলা তো এক নয়। এলার সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করে: "...ভালোবাসার গুরুভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও" (পৃ. ২৫)। এই বিশ্বাসের বলেই ইন্দ্রনাথ এলাকে আশ্বাস দিতে পারে: "কোনো ভয় নেই, খুব ভালোবাসো। শুধু মা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে, তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর—মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি। এই মিলনকে নিস্তেজ কোরো না সংসার-পিঁজরেয় বেঁধে" (পৃ. ২৬)। এলা ভালোবাসার অনুমতি পেল: কিন্তু এমন ভালোবাসা, যা শুষ্ক, রুদ্র, যার মধ্যে সংসারের পিঁজরেয় বাঁধা পড়বার কোনো আকৃতি নেই। এমন শুষ্ক রুদ্র ভালোবাসার সাধনা তার সাধ্যায়ত্ত কিনা সে বিষয়ে এলা সন্দিহান নয়; কিন্তু ইন্দ্রনাথের দাবি তার অসাধারণত্বের উপর। অন্যের পক্ষে যা সম্ভব নয় এলার পক্ষে তা সম্ভব: ইন্দ্রনাথ বারবার এলাকে এ কথাই বিশ্বাস করতে বলে। ইন্দ্রনাথ জানত: "দাবির জোরেই দাবি সত্য হয়" (পৃ. ২০)। ইন্দ্রনাথের দাবির জাদুস্পর্শে এলার মুক্তিকামনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অসাধারণত্বের অগ্নিপরীক্ষায় হার-মানা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। অঙ্গীকারের জাল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা হল পরাহত।

দলের সঙ্গে এলার অসামঞ্জস্য আছে তবু নিষ্কৃতি নেই। অতীনের কাছে মন বাঁধা: তবু মিলনের পথে পণের বাধা। এমনি এক নিরুদ্দেশ অসহায়তার

মাঝ-দরিয়ায় পড়ে এলা অতীনকে বোঝাতে চেষ্টা করে কেন সে অতীনের দাবিকে মেনে নিতে পারল না, কোথায় তার বাধা। এলার যুক্তি প্রধানত দুটি। একদিকে স্বজাতির প্রতি আপন মনোভাব, আর-এক দিকে পুরুষের প্রতি— বিশেষ করে অতীন্দ্রের সম্বন্ধে— তার ভাব-রঞ্জিত ধারণা।

"পৃথিবীতে সব চেয়ে জঘন্য যে স্পাইয়ের ব্যাবসা সেই ব্যাবসাতে মেয়েদের নৈপুণ্য পুরুষের চেয়ে বেশি, এ কথা যখন বইয়ে পড়লুম তখন বিধাতার পায়ে মাথা ঠুকে বলেছি, সাতজন্মে যেন মেয়ে হয়ে না জন্মাই" (পৃ. ৫৯)। এই খেদোক্তির মধ্যে স্বজাতির প্রতি এলার ঘৃণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘৃণার কারণ: মেয়েরা "বায়োলজির সংকল্প বহন করে" জগতে এসেছে, সঙ্গে নিয়ে এসেছে "জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র।" এই-সব অস্ত্র ও মন্ত্র "ঠিকমত ব্যবহার করতে জানলেই শস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন।" এই যে "শস্তায় জিতে নেওয়া": এর মধ্যে গ্লানি আছে আর সেটাই এলাকে লজ্জা দেয় গভীর ভাবে; "শস্তা" জয়ের পথ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই জয়ের সঠিক রূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে এলা দেখতে পায় এটা আর কিছুই নয়, শুধু পুরুষকে নীচে নামানো। প্রাকৃত নারীর টানে পুরুষ নেমে আসে বায়োলজির নীচের তলায়, অলস ভোগের গ্লানির মধ্যে। এটাই যেন নারী-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা প্রয়োজনের প্রশ্ন ওঠে না: "নীচে টেনে আনবার একটা সাধারণ ষড়যন্ত্রে আমরা সমস্ত মেয়ে এক হয়ে যোগ দিয়েছি, সাজে সজ্জায় হাবেভাবে বানানো কথায়" (পৃ. ৫৬)। শুধু অতীন্দ্র নয়, ইন্দ্রনাথের কাছেও সে তার এই মত প্রকাশ করে বলেছে: "মেয়েরা নিঃশব্দ নৈপুণ্যে প্রশ্রয় ঘটিয়েছে আর তার দায় মানতে হয়েছে পুরুষকে, আমার অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনার অভাব নেই" (পৃ. ২৩)। তার বিদগ্ধ বিচারবুদ্ধির কাছে এই নীরব প্রাকৃত ষড়যন্ত্র লজ্জাকর ঘৃণ্য রুচিবিরুদ্ধ; এলা সর্বতোভাবে তা পরিহার ক'রে চলতে চেষ্টা করে। তাই এলার জীবনবাদে প্রেমের সার্থকতা সম্ভোগে নয়, ত্যাগে— স্বাধিকার-প্রসারে নয়, মুক্তি-দানে।

এলা বিশ্বাস করে: "পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো" (পৃ. ৫৫) এই বড়োকে সে বড়ো করেই দেখতে চেয়েছে, বড়ো করেই রাখতে চেয়েছে। পুরুষকুলে আবার অতীন্দ্র পুরুষোত্তম— "কারো মতো নও যে তুমি; মস্ত তুমি।

তফাতে আছি বলেই দেখতে পেলুম সেই তোমার অলোকসামান্য প্রকাশ। সামান্য আমাকে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবার কথা কল্পনা করতে আমার ভয় করে" (পৃ. ৫৫)। এমন পুরুষকারের আত্মবিকাশের জন্য বিরাট পরিসরের প্রয়োজন। নারীর দেহনির্ভর ভালোবাসার গণ্ডি ছোট্ট। সেখানে বন্দী হয়ে পড়লে অতীন্দ্র তার অলোকসামান্য পরিচয় হারিয়ে ফেলবে আর সেইসঙ্গে হারিয়ে যাবে এলার কাছেও। এই ভয়েই এলা তাকে কাছে পেয়েও দূরে সরিয়ে রাখল। অতীন্দ্রকে সে বোঝাবার চেষ্টা করে : "তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি জানি অন্তু। আমার আদরের ছোটো খাঁচায় দু দিনে তোমার ডানা উঠত ছটফটিয়ে। যে তৃপ্তির সামান্য উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেকত তলানিতে এসে। তখন জানতে পারতে আমি কতই গরিব। তাই আমার সমস্ত দাবি তুলে নিয়েছি, সম্পূর্ণ মনে সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে। সেখানে তোমার শক্তি স্থান-সংকোচে দুঃখ পাবে না" (পৃ. ৬০)। এই অনাগত দিনের দেউলে-হবার সম্ভাবনা তার বর্তমানের পাওয়ার আশার উপর কালো ছায়া ফেলেছে। এলা তার মনকে এ কথা বোঝায় : সে যদি অতীন্দ্রকে ভুজপাশ-মুক্ত করে রাখে তবেই তার অন্তু চির-পাওয়ার ধন হয়ে থাকবে। সংসারসীমার বাইরে বিরাট কর্মক্ষেত্রে সহকর্মিতার মধ্য দিয়ে যে বিদেহী পাওয়া শুধু সেইটুকুই এলার কাম্য। এ কথা অবশ্য সে অস্বীকার করে না যে, এমন বিদেহী পাওয়া দুঃসহ। গভীর দুঃখে অতীনকে সে জানায় : "যে আশ্চর্য সৌভাগ্য সকল সাধনার অতীত, যা দৈবের অযাচিত দান, তা এল আমার সামনে, তবু নিতে পারলুম না। হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁট বাঁধা, তৎসত্ত্বেও এত বড়ো দুঃসহ বৈধব্য কোনো মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে" (পৃ. ৪৯)। কিন্তু এই শূন্যতার হাহাকারকেও ছাপিয়ে ওঠে তার অসাধারণ ত্যাগের আত্মতুষ্টি : "...তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না এমন মেয়ে হয়তো আছে ; তারা ট্র্যাজেডি ঘটিয়েছে কত আমি তা জানি। চোখের সামনে দেখেছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিল না ; সেই মেয়েরা বুঝি মনে করে তাদের জড়িয়ে ধরাই যথেষ্ট" (পৃ. ৫৫)। এখানেই এলার আত্মশ্লাঘা যে সে এমনতরো জড়িয়ে-ধরার দলে নয় ; সে পুরুষের পুরুষকারকে চিনতে পারে, নিজের দুঃখ স্বীকার করেও পুরুষের অসামান্যতার সাধনাকে নিষ্কণ্টক রাখতে পারে।

এলার অপূর্ণতার বেদনায় এইটুকু শুধু সান্ত্বনার প্রলেপ।

এলার চিন্তাধারার মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যেটা অতীন্দ্রের কাছে আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তরমাত্র। প্রথমত, এলা যে-পণ-রক্ষার দোহাই পাড়ে অতীন্দ্র সেটাকে অসত্য মনে করে, কারণ সেটা স্বধর্মবিরোধী। এলাকে আপন করে পেল না বলে অতীন্দ্র যখন দুঃখ করে, এলা তখন স্বপক্ষে যুক্তি দেখায় : "আমার উপায় ছিল না অন্তু। দ্রৌপদীকে দেখবার আগেই কুন্তী বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ো। তুমি আসবার আগেই শপথ করে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একলার জন্যে কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগ্‌দত্তা" (পৃ. ৪৮)। এইখানেই অতীন্দ্রের নালিশ : "অধার্মিক তোমার পণগ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্ম-বিদ্রোহ" (পৃ. ৪৮)। ভালোবাসা পবিত্র। ভালোবাসার মধ্যে যে চাওয়া আছে তা-ও পবিত্র, কারণ সেটা মানুষের একটি সহজাত এষণা, অন্তর্যামীর আদেশবাণী। যে আদর্শ এই স্বতঃসিদ্ধ এষণাকে অস্বীকার করে, তার প্রকাশপথ রুদ্ধ করে রাখে, সে আর যাই হোক মানবিক আদর্শ হতে পারে না। কর্তব্যবোধ যখন মানবতার দাবির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ভালোবাসার সঙ্গে তার কোনো বিরোধ থাকে না, কারণ ভালোবাসাও যে মানবতার দাবি। কিন্তু দ্বন্দ্ব জাগে যখন দল বা গোষ্ঠীর বানানো কর্তব্যবোধকে মানবিক কর্তব্যবোধের সাজ পরিয়ে পূজাবেদীতে বসানো হয়। এলা সেই নকল দেবীর সামনে বলি দিয়েছে তার ব্যক্তিত্বকে তার সহজাত স্বভাবকে। মানবধর্মের কাছে স্বভাব-হননের মতো বড়ো পাপ আর নেই। এলা যাকে মহিমময় ত্যাগ বলে মনে করে, আত্মতৃপ্তি লাভ করবার চেষ্টা করে, অতীন্দ্রের কাছে তা কেবলমাত্র অর্থহীন নয়, নীতিবিগর্হিত অধার্মিক আত্মপ্রবঞ্চনা।

দ্বিতীয়ত, নারীত্ব সম্বন্ধে এলার ধারণাকেও অতীন্দ্র ভ্রমান্ধ বলে উড়িয়ে দেয়। সে বিশ্বাস করে : মেয়েদের ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় মাধুর্যের দানে। এলা যাকে প্রকৃতির জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র বলে ঘৃণা করে, তাদের মধ্যে আছে বিধাতার কল্পনার স্পর্শ : "রঙে সুরে আপন দেহে মনে অনির্বচনীয়কে" প্রকাশ করবার প্রতিশ্রুতি। নারীর মাধুর্যের দানে পুরুষ চরিতার্থ হবে, এটাই বিধিলিপি। যে পুরুষ "সেই বিধিলিপিকে ব্যর্থ করে, সে পুরুষ নামের যোগ্য নয়।" অতীন্দ্র বিশ্বাস করে : পুরুষ যখন তার পৌরুষ হারায় তখনই মেয়েরা নেমে আসে আর নামায় নীচতার দিকে।

অতীন্দ্র যেন এলার আত্মসমর্থনের সবগুলো পথ বন্ধ করে দেয়, তার সুচির-সঞ্চিত ধারণাগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলে। তবু এলা যুক্তির ব্যূহ রচনা করে যায়, তবু চেষ্টা করে তার কৃতকর্মকে সমর্থন করতে। কিন্তু তার বিশ্বাসের আয়ু এসেছে ক্ষীণ হয়ে, তার প্রতিবাদের ভাষায় আর তীব্রতা নেই। এমন সময় অতীন্দ্র চরম আঘাত হানে একেবারে এলার অহংকারের মর্মস্থলে। এলা শোনে অতীন্দ্রকে সে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে বিপথে। তার কানে বাজে অতীন্দ্রের রূঢ় নালিশ: "আপন দেশে আপন স্থান নেবার দায় ছিল আপন শক্তিতেই, সে শক্তি আমার ছিল। কেন তুমি আমাকে সে কথা ভুলিয়ে দিলে" (পৃ. ৬১)। যে পুরুষমৃগয়া আজীবন এলার কাছে ঘৃণ্য ছিল সেই মৃগয়ার অভিযোগই তার বিরুদ্ধে! এ যেন নিয়তির তির্যক হাসি।

একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য সম্বন্ধে এলা আগাগোড়াই উপকথার উটপাখির মতো আত্মপ্রবঞ্চনার বালিতে মাথা গুঁজে ছিল নিশ্চিন্ত চিত্তে। ইন্দ্রনাথ যখন তাকে বলত: "কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়।" তখন সে যেন বুঝেও বুঝত না তার আগুন-জ্বালানো শক্তির উৎস কোথায়। ছেলেদের প্রেরণা জোগাবার কাজে "প্রকৃতির জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র"-ই কি তার একটা প্রধান সহায় ছিল না? দান-সংগ্রহের ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে অতীন্দ্র তো বলেইছে: "দুঃসাধ্য ক্ষতিসাধনের শক্তি এই দেহে দুর্জয়বেগে সঞ্চার করলে কে। সংগ্রহের ভার যদি থাকত আমাদের গণেশ মজুমদারের 'পরে তা হলে তার পৌরুষ আমার কাপড়ের বাক্সে ক্ষতি করত অতি সামান্য" (পৃ. ৪৪)। কিন্তু তখন তার মনে আত্মপ্রসাদের রঙিন নেশা। অতীন্দ্রের এই হালকা কথাগুলির আড়ালে যে রুক্ষ সত্য ছিল, সেটা তার কাছে তখনো ধরা পড়ে নি। তাই অতীন্দ্রের মর্মঘাতী স্পষ্টোক্তি তাকে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো এক নিমেষে সচেতন করে তুলল। কোনো জবাব পায় না খুঁজে, ক্লিষ্টকণ্ঠে সে শুধু অতীন্দ্রকে প্রশ্ন করতে পারে: অতীন ভুলল কেন, কেন সে গোড়াতেই এলাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল না। অতীন্দ্রের নির্মম উত্তর তার আত্ম-প্রবঞ্চনার শেষ আশ্রয়টুকু ভেঙেচুরে দেয়: "ভোলাবার শক্তি তোমাদের অমোঘ, নইলে ভুলেছি বলে লজ্জা করতুম। আমি হাজার বার করে মানব যে, তুমি আমাকে ভোলাতে পার, যদি না ভুলতুম, সন্দেহ করতুম আমার পৌরুষকে" (পৃ. ৬২)।

আত্ম-অপরিচিতির অন্ধকার হতে অতীন্দ্র এলাকে নির্মমভাবে টেনে নিয়ে আসে আলোর স্বচ্ছতায়। আত্মপ্রবঞ্চনার কুহক-জাল আপন হতে ছিঁড়ে যায়, নিজেকে আবিষ্কার করে। তার গুহাহিত তুষারহিম নারীচেতনা সেই আবিষ্কারের আলোকে সহসা সজীব চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন সংস্কারমুক্ত উচ্ছল আবেগ তার কণ্ঠে জাগিয়ে তোলে অনবদমিত সমর্পণের উচ্ছ্বাস: সে বলতে পারে: "দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও, এই নাও, এই নাও" (পৃ. ৬৬)।

অনুচিত কর্মারম্ভের অন্তে আছে গ্লানি, আছে অনুতাপ, আছে ব্যর্থতার হাহাকার। এলার জন্য সেই ভাগ্যই প্রতীক্ষা করছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে যে-এলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সে অধীর বিহ্বল অনুশোচনায় দীর্ণচিত্ত। অতীন্দ্রের সস্নেহ মন্তব্যের মাঝে তখনকার এলার একটি স্বচ্ছ ছবি পাওয়া যায়: "এতক্ষণে সেই মেয়ের প্রকাশ হল যে মেয়েটি রিয়ল্" (পৃ. ৮৪)। এই 'রিয়ল্' মেয়েটি চিরদিনের জানাশোনা আত্মসংবৃত এলা নয়— এ মেয়েটি প্রিয়জনের অদর্শনে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে, সমস্ত বিপদবাধা শুভ-অশুভ তুচ্ছ করে ভুতুড়ে পাড়ায় ছুটে আসে: এ মেয়েটি পুরুষের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে স্বীকার করে: "অতীন, অতীন, পারলুম না থাকতে" (পৃ. ৭৭)। এমন ভুতুড়ে পাড়া যেখানে কোনোদিন কোনো বাঙালি ভদ্রমহিলার আবির্ভাব ঘটে নি, সেখানে এলাকে কেন ছুটে আসতে হল সে কথা অতীন্দ্রকে এখন নিঃসংকোচে জানাতে পারে এলা: "… বাংলাদেশের কোনো ভদ্রমহিলার অদৃষ্টে এতবড়ো গরজ এমন দুঃসহ হয়ে কোনোদিন প্রকাশ পায় নি" (পৃ. ৭৮)। কিন্তু ঐ গরজ শুধু কেবল তার নিজের কারণে নয়, অতীন্দ্রের জন্যও। এলা এ কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না যে, সে তার একমাত্র প্রেমপাত্রকে পথভ্রষ্ট করেছে। "… আমার ভুলে তুমি কেন ভুল করলে। কেন নিলে জীবিকাবর্জনের দুঃখ" (পৃ. ৮৪)। এই প্রশ্নের উত্তর এলার কাছে আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। সস্নেহে অতীন্দ্র তাকে বোঝায় তার কোনো দায়িত্ব নেই। বলে: "আমি ছিটকে পড়েছি রাস্তায় অন্তরের বেগে, তুমি উপলক্ষমাত্র। অন্য কোনো শ্রেণীর বঙ্গমহিলাকে উপলক্ষ পেলে এতদিনে গোরা-কালা-সম্মিলনী ক্লাবে ব্রিজ খেলতে যেতুম, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গবর্নরের বাক্সের অভিমুখে স্বর্গারোহণপর্বের সাধনা করতুম। যদি প্রমাণ হয় আমি মূঢ় তবে জাঁক করে বলব সে মূঢ়তা স্বয়ং আমারই, যাকে

বলে ভগবদ্দত্ত প্রতিভা" (পৃ. ৮৩-৮৪)। কিন্তু এ যেন মামুলী সান্ত্বনা। এর মাঝে এলা আপন শাপমুক্তির কোনো সন্ধান পায় না।

বনস্পতিকে বাড়তে না-দেওয়া এলার চোখে অমার্জনীয় অপরাধ। অথচ ভাগ্যচক্রে সে-ই আজ কাঠগড়ায়। অপরাধের গুরুভার সিন্ধুবাদের ঘাড়ে-চড়া বুড়োটার মতো তার বিবেকের কাঁধে চেপে বসে আছে। কিছুতেই নিস্তার নেই। একদিন অহংকার করে অতীন্দ্রকে বলেছিল : "তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি জানি অন্তু" (পৃ. ৬০)। কিন্তু এখন আর তার সেই অহংকার নেই। এখন সে অনুশোচনায় নম্র। সে স্বীকার করে: "যখন তোমাকে চিনতুম না তখন তোমাকে এই রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি" (পৃ. ৮৩)। অনুতাপের অন্ধকারে তার শুধু একটা ক্ষীণ আশার আলো : যদি অতীন্দ্রকে জীবনের পথে ফেরানো যায়। সেই আশায় উৎকণ্ঠ হয়ে করুণ মিনতি জানায় এলা : "ফিরে এসো, অন্তু। এত বছর ধরে যে বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম তার ভিত তুমি ভেঙে দিয়েছ। আজ আছি ভেসে-চলা ভাঙা নৌকো আঁকড়িয়ে। আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাও।··· এখনই তুমি হুকুম করো, আমি ভাঙব পণ। ভুল করেছি আমি। আমাকে মাপ করো" (পৃ. ৯৫)। এই প্রাণভরা মিনতি, এই বিহ্বল ক্ষমা-প্রার্থনা : সবই এখন বৃথা। অতীনের মুক্তি-পথ বন্ধ। বিবাহ-বিমুখ এলা এক কূল-ভাঙানো প্লাবনের মুখে দাঁড়িয়ে অসহায় বেদনায় নিবেদন করে: "আমি স্বয়ম্বরা, আমাকে বিয়ে করো অন্তু। আর সময় নষ্ট করতে পারব না— গান্ধর্ব বিবাহ হোক, সহধর্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে" (পৃ. ৯৫)। কিন্তু অতীন অটল। দিশাহারা এলা পথ খুঁজে পায় না কেমন করে সে বোঝাবে অন্তুই তার নিষ্ফল নিঃসঙ্গ জীবনে একমাত্র অবলম্বন : "তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, এ কথায় আজ যদি বা সন্দেহ করো, একান্ত মনে আশা করি, মৃত্যুর পরে সে সন্দেহ ঘোচাবার একটা-কোনো রাস্তা কোথাও আছে" (পৃ. ৯৭)। তার এই আকুল আবেদন চাপা পড়ে যায় অতীন্দ্রের কর্তব্যের আহ্বানে, যে-কর্তব্যের পথে এলাই তাকে টেনে এনেছে। এবার এলাই তাকে বাধা দেয়, এলাই তার পা জড়িয়ে ধরে, বলে : "···আমাকে ফেলে যেয়ো না, ফেলে যেয়ো না!" কিন্তু ব্যর্থ হয় এই আবেগোদ্বেল মিনতি। একদিন পথ বেঁধে দিয়েছিল তাদের গ্রন্থি। আজ পথই

আবার ছেদন করল সেই গ্রন্থি। তৃতীয় অধ্যায়ে অতীন্দ্রের নিষ্ক্রমণ যেন অন্ত-হীন বিচ্ছেদের ইঙ্গিত। দুঃসহ নিরাশার বেদনায় এলা ইন্দ্রনাথের সামনে ভেঙে পড়ে, বলে: "ফিরিয়ে আনুন অন্তুকে।" অভাগী এলা সেদিন ব্যর্থতার আঘাতে এতই দিশাহারা যে, সে বুঝতেই পারল না কার কাছে তার এই অনুনয়। ইন্দ্রনাথের ডাক্তারী চোখে এলা তখন গুটি-বেরুনো অস্পৃশ্য রোগী— আশু বর্জনীয়।

একদিন এলা ইন্দ্রনাথকে গর্ব করে জানিয়েছিল: "মাস্টারমশাই, মনে রইল আপনার কথা, প্রস্তুত থাকব। আমাকে সরাবার দিন হয়তো আসবে, নিঃশব্দেই মিলিয়ে যাব" (পৃ. ৩১)। অবশেষে তার নিঃশব্দ সমাপ্তির দিন এল। সেই দিনটির দূত হয়ে এল স্বয়ং অতীন্দ্র। অতীন্দ্র এলার মহাজীবন, অতীন্দ্রই তার মহামরণ। অতীন্দ্র তাকে মৃত্যুতত্ত্ব বোঝায়। সে শোনে মৃত্যুই মোহরাত্রির অবসান। তার জীবনে মৃত্যু সত্যিই এল "বঞ্চনার দলিলটা"কে লোপ করে দেবার জন্য। তাই মৃত্যুমুখী এলা সহসা এক অপরূপ আত্মোপলব্ধির আলোয় জ্যোতির্ময়ী হয়ে ওঠে।

আত্মোপলব্ধির দুটো দিক আছে: নিজের সত্য পরিচয় জানা এবং সেই পরিচয়কে সত্য বলে গ্রহণ করা। শেষ অধ্যায়ে এলার আত্মোপলব্ধি পূর্ণ হল। কারণ সেদিন সে আপনার নারীসত্তাকে জেনেই ক্ষান্ত হল না। তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতেও আর কোনো দ্বিধা জাগল না মনে। মৃত্যু যেন তাকে দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত সুযোগ এনে দিল আত্মসমর্পণের। চরম পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা তাকে ত্রস্ত করে না। বরং, আগ্রহে অধীর হয়ে ওঠে এলা। অতীন্দ্রের হাতে মৃত্যু: এর চেয়ে কাম্যতর তার আর কিছুই নেই: "মারো আমাকে অন্তু, নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হতে পারে না" (পৃ.১১৫)। এখন এলা মনে প্রাণে জেনেছে, সে অতীন্দ্রের। এই জানার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই, কোনো ফাঁক নেই, কোনো কুয়াশা নেই। জানার পূর্ণতা তার 'মধুর বেদন-বিধুর হৃদয়ে' এক অনৈসর্গিক আনন্দের উদারতা জাগায়। অতীন্দ্রের দ্বিধা দেখে এলাই তাকে সান্ত্বনা দেয় আত্মনিবেদনের মর্মস্পর্শী আবেগে: "একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণই তোমার— মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার" (পৃ. ১১৬)। এত দিনে

দেহ পেল স্বীকৃতি। একদিন তার কাছে দেহ ছিল নিছক বায়োলজির বাহন। আজ তা পবিত্র অর্ঘ্য হয়ে উঠল। জীবনে অতীন্দ্রকে এলা যা দিতে পারে নি জীবন-সীমানায় দাঁড়িয়ে তাই দিয়ে যাবার অকৃপণ প্রতিশ্রুতি। অতীতের কার্পণ্যের দীনতা সে মুছে ফেলতে চায় শেষ মুহূর্তের অমলিন দানে। যে পবিত্র অর্ঘ্য বন্দনায় লাগল না, সেই দেহই হল মৃত্যুর নৈবেদ্য। দ্বিধাহীন হাতে এলা "ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা", যেন ছিঁড়ে ফেলে তার ভ্রূকুটিকুটিল আত্মনিষেধের পরোয়ানা। তার ব্যঞ্জনার মধ্যে প্রকাশ পায় এক রুদ্ধশ্বাস ব্যাকুলতা। প্রতিটি মুহূর্ত যে তার কাছে অমূল্য। মৃত্যুকে শিয়রে দাঁড় করিয়ে রেখে সে প্রত্যেক মুহূর্তের দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া মিলনস্পন্দন সমস্ত সত্তা দিয়ে তিল তিল করে অনুভব করতে চায়। অতীনকে বুকে চেপে ধ'রে এলা তার শেষ আদরের ডাক ডেকে নেয়। শেষ নিবেদন জানিয়ে যায়: "অন্তু, অন্তু আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালোবেসেছি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো, আমাকে মারো" (পৃ. ১১৬)। মৃত্যু তার মোহমুক্তির পথ। নির্ভয়ে তাকে সে অভ্যর্থনা করে। চৈতন্যের শেষ মুহূর্তটুকুও সে তার জীবনদেবতাকে দিয়ে যাবে এই শুধু তার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা। অতীন্দ্রকে ক্লোরোফর্মের শিশিটা ফেলে দেবার আদেশ দিয়ে এলা মিনতি জানায়: "...জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো।" এলার শেষ চুম্বন অফুরান হল মৃত্যুর অসীমতায়।

এক অপূর্ব চিন্ময়ী নারী-চরিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে এলার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ নারীচরিত্ররচনায় যে অদ্বিতীয় সে কথা নূতন করে প্রমাণ করল এলা। নিষ্ফলতার বেদনা, আত্মসমর্পণের আনন্দ, শৃঙ্খলোন্মুক্ত অন্তরাবেগের বাধাবন্ধহারা প্রবাহ, চেনার অন্তিম মুহূর্তে দুর্লভ মিলনের চরম উপলব্ধি: শেষ অধ্যায়ে একসঙ্গে যেন বীণার সবগুলি তার ঝংকৃত হয়ে উঠল জীবনরাগিণীর সমে-আসা মূর্ছনায়।

অতীন্দ্রনাথ

"কী বলব বাবাজি, আমার যদি মেয়ে থাকত আর এমন লেখা যদি সে তোমার কলম থেকে বের করতে পারত তা হলে সার্থক মানতুম আপন পিতৃপদকে" (পৃ. ৭৪)। যার সম্বন্ধে কানাই গুপ্তের মতো অকাল্পনিক প্র্যাক্‌টিকাল লোকের মুখেও এই স্নেহমধুর প্রশস্তি সে অতীন্দ্রনাথ। আর, যে লেখা পড়ে তার এই উচ্ছ্বাস সেটা অতীন্দ্রনাথের ডায়ারি। ডায়ারি রাখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত'-এ একটি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন, "ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহাকে ভাঙিয়া আর-একটি লোক গড়িয়া আর-একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।"[১] স্বধর্মের ছাঁচে যখন নানা চিন্তা নানা কাজ গেঁথে গেঁথে জীবনকে সহজ স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে তুলি, তখন তার ডায়ারির জীবন সেখানে বিসদৃশ কৃত্রিমতা। কিন্তু অতীন্দ্রের কাছে বাস্তব জীবনটাই কৃত্রিম, ডায়ারির জীবন সত্য। ডায়ারির জীবনে প্রকাশ পেয়েছে তার ভাবের রাজ্য। কানাই গুপ্ত যথার্থ বলেছে: "কেবল ভাবের দিক থেকে এত ঘৃণা এত অশ্রদ্ধা যে, তা কোনো পেনশনভোগী মন্ত্রীপদপ্রার্থীর কলম দিয়ে বেরোলে রাজ-দরবারে তার মোক্ষলাভ হত" (পৃ. ৭৩)। একদিকে বাস্তব জীবন যেখানে চিন্তায় কর্মে বিরোধ, স্বভাবের সঙ্গে অস্বাভাবিকতার দ্বন্দ্ব, জীবনযাত্রায় স্বধর্মের কোনো সীলমোহর নেই। আর-এক দিকে ভাবের রাজ্য যেখানে দৈনন্দিন কৃত্রিম অর্থহীন কর্মকলাপের নিরন্তর নির্মম বিশ্লেষণ মূল্যায়ন। অস্তিত্ব এবং সত্তা : স্বভাব এবং স্বধর্ম : এই দুস্তর মেরুবিভাগ অতীন্দ্র-জীবনের ট্র্যাজেডি।

মানুষের অন্তর্জগৎ বৈচিত্র্যে ভরা। কত তার চিত্তবৃত্তি, কত শাখাপ্রশাখা। চিত্তবৃত্তির মধ্যেও আবার দেখা যায় কখনো সদ্ভাব কখনো বিরোধ, কখনো শান্তির সামঞ্জস্য কখনো অসদ্ভাবের বৈষম্য। মন একই, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গিমা কত

১. "পরিচয়", পঞ্চভূত, পৃ. ৭২

বিচিত্র। তাই 'মানুষ' সম্বন্ধে ধারণা বা ধীকল্প (concept) বহুবিধ।

ধীকল্পগুলির বহুত্ব এবং তাদের সমন্বিত তাৎপর্য সম্বন্ধে H. G. Blackman-এর যে উক্তি Ralf Ruddock উদ্ধৃত করেছেন সেটা বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে সুপ্রযোজ্য : "These different concepts are not of merely speculative interest, for they have practicable consequences. They have governed different systems of ethics. Human nature is interlinked with human destiny, that is to say with goods to be chosen and pursued, evils to be recognized and avoided, heaven and hell.[১]

বিভিন্ন দিক থেকে যদি মানুষের সমীক্ষণ করা হয়, তা হলে ফলশ্রুতির বিভিন্নতা থাকবেই। তাই মনস্তত্ত্বে সমাজতত্ত্বে অনেক শাখা-প্রশাখা দেখা যায়। আরো বিশেষ ক'রে নজরে পড়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতভেদ। যেমন আমরাই বলি, মানুষ অমৃতের সন্তান ইন্দ্রিয়ের দাস, জনপ্রেমী জনবিদ্বেষী, সত্তালাভের মুক্তি জৈবিক অস্তিত্বের শৃঙ্খল।

এই অন্তর্বিরোধী বৃত্তির মানুষটিকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? কোথায় আছে তার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য? মানবপ্রকৃতির অন্দরমহলে ঢুকবার জন্য দুটি প্রবেশপথ আছে : স্বভাব এবং স্বধর্ম। তারা পরস্পরাশ্রয়ী, একটিকে ছেড়ে দিলে অন্যটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাদের সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়েই মানব-প্রকৃতিতে ঐক্য সৃষ্ট হয়। চার অধ্যায়ে দুটি চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে তারা হল ইন্দ্রনাথ এবং অতীন্দ্র। তাদের চরিত্রের মধ্যে যথাক্রমে ঐক্য এবং অনৈক্য দেখা যায়। ইন্দ্রনাথ সুসমন্বিত; সে জানে সে কী চায় এবং স্বভাবকে সেইভাবেই গড়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে, সে এমনিভাবে স্বভাবকে গড়ে তুলেছে যে, তার স্বভাব ও স্বধর্মে কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু অতীন্দ্র একেবারে বিপরীত, যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বৃক্ষ। স্বভাবহনন এবং স্বধর্মভ্রংশন তার বিরামবিহীন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মগ্লানির উৎস। সেই কারণে তার চরিত্র জটিল। গ্রন্থির পর গ্রন্থি। তারা পরস্পরকে এমনভাবে

---

১. "Introduction", ***Six Approaches to the Person,*** Ralf Ruddock (ed.), Routledge & Kegan Paul, 1972. p. 8

জড়িয়ে আছে যে, জট খোলাই এক দুরূহ কাজ। রবীন্দ্রসাহিত্যে এমন জটিল ব্যক্তিমানসের দোসর খুঁজে পাওয়া কঠিন।

প্রকৃতি জন্মগত। স্বভাব-স্বধর্ম জন্মোত্তর সৃষ্টি। স্বভাব এবং স্বধর্ম প্রকৃতির সহজাত প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে নিয়ে যায়। উদ্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ণীত হয় স্বভাব-স্বধর্মের সৃজনমুখী প্রতিভার আলোয়। মানুষ নিজের স্বভাব নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে অহোরাত্র। সৃষ্টিপথের নির্দেশ আসে স্বধর্মের কাছ থেকে। প্রকৃতি-স্বভাব-স্বধর্ম : এই তিনটি নিয়ে যেটা গড়ে ওঠে তার নাম চরিত্র।

সাধারণত মানুষের প্রকৃতিতে চারটি চিত্তবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায় ; যেমন (C. J. Jung-এর মতে) চিন্তন (thinking), সংরাগ (feeling), সংবেদন (sensation) এবং স্বজ্ঞা (intuition)। এই চতুষ্টয় বৃত্তির ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। একটি বিশিষ্ট সামাজিক পরিবেশে ব্যষ্টি ও সমষ্টির দেওয়া-নেওয়া, দ্বন্দ্ব-মিলনের সম্পর্ক হতে চিত্তবৃত্তির এক-একটা নির্দিষ্ট আকার পায়, রসালো হয়ে ওঠে। এইটে হল স্বভাব : চতুর্বৃত্তির ধারাক্রমকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করা।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভাবরূপ আছে নিশ্চিত। না থাকলে চলার অর্থই হারিয়ে যেত, চালচলনে ছন্দ থাকত না। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সমাজ শব্দটি সংঘবদ্ধ পরিক্রমণকে বোঝায়। তাই সমাজের ঐকতানে রাখীবন্ধনের মন্ত্র। ব্যষ্টির মূল্যায়ন হয় সমষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে। মূল্যায়নের মানদণ্ড হল : সবার মাঝে নিজেকে দেখা এবং নিজের মধ্যে সকলকে দেখা। মনস্তত্ত্বে, সমাজতত্ত্বে এই প্রক্রিয়াকে বলে internalization of the external এবং externalization of the internal। এই প্রক্রিয়া আছে বলেই মানবচেতনায় 'বহু' এবং 'এক' সমন্বিত-রূপে বিরাজ করে। এটাই হল স্বভাবের মূলধনের কোষাগার। এখানে আছে মানবিক অন্তরের ঐশ্বর্য : সত্য শিব সুন্দর ; আছে তাদের থেকে সঞ্জাত মানবিক মান ; যেমন, সাম্য সখ্য স্নেহ ন্যায় প্রেম আত্মমর্যাদা এমনি আরো কত। প্রত্যেকটি মান রাখীবন্ধনের মন্ত্রে উজ্জীবিত। এই মূলধনের জোরেই মানবস্বভাব প্রকৃত ধনী হয়ে ওঠে। কোষাগারের প্রহরী হল স্বধর্ম। যা-কিছু মানুষকে 'ধারণ' করে অর্থাৎ যেটা জীবনধারণের অবলম্বন।

"অবলম্বন" বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা হল : "যে লোক ডুবজলে সাঁতার দেয়, যার কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই, সামান্য হাঁড়ি-কলসী কলার ভেলা তার পরম ধন— তার ভয় ভাবনা উদ্‌বেগের সীমা নেই। আর যে ব্যক্তির পায়ের নীচে সুদৃঢ় মাটি আছে তারও হাঁড়ি-কলসীর প্রয়োজন আছে, কিন্তু হাঁড়ি-কলসী তার জীবনের অবলম্বন নয়— এগুলো যদি কেউ কেড়ে নেয় তা হলে তার যতই অভাব অসুবিধা হোক-না, সে ডুবে মরবে না।"[১] সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাস অবলম্বনের কাজ করে; তারই বলে চিত্তের দৃঢ়নির্ভরতা জাগে; সে জানে এই বিশ্বাস যে-মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই আমাদের ধর্ম-সাধনা প্রতিষ্ঠিত। 'ধর্ম' শব্দটির মর্মকথা : আত্মক্রান্তির সাধনা। ঈশ্বরবাদই হোক নিরীশ্বরবাদই হোক, অস্তি-নাস্তিবাদ নির্বিশেষে সব ধর্মের অন্তরে আছে একই কুসুমের কোরক : ব্যক্তি-মানুষের নিজেকে অতিক্রম করবার সম্ভাবনা। আর, আছে গভীরতম আশা প্রগাঢ়তম প্রত্যয়। এই তো ধর্ম, এই তো অবলম্বন। আত্মিক অবলম্বন। তার মধ্যেই নিহিত আছে মুকুলপ্রতিম আত্মপরিচয় যেটা পরিবেশের আলোছায়ায় প্রস্ফুট হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি-মানসের ধর্ম হল নিজেকে অতিক্রম করা, অর্থাৎ আত্মক্রান্তি : 'আমি' ছেড়ে 'আমরা'-য় পৌঁছনো, একাত্মা ছাড়িয়ে সর্বাত্মাকে পাওয়া। আত্মক্রান্তির জন্য চাই সামাজিক পরিবেশ তথা দৃঢ়নির্ভরযোগ্যতা। তুমি আছ, সে আছে, বাহির-বিশ্ব আছে : এ-সব কথা তোমরাই আমাকে জানিয়ে দাও, জাগিয়ে তোল আত্মবোধ : আমি আছি। আমার সত্তা উপলব্ধি করি তখনই যখন আমার 'আমি' ডুবে যায় "আরো প্রেমে আরো প্রেমে"। তোমাদের কল্যাণে আমার কল্যাণ; আমার মঙ্গলে তোমাদের মঙ্গল। তোমাদের কাছ থেকেই জেনেছি সত্য-শিব-সুন্দর মানবজীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর তাৎপর্য কী, তাও তোমাদের কাছ থেকেই শিখেছি। আমার আত্মক্রান্তির দুঃসাধ্য সাধনায় প্রেরণা জুগিয়েছ তোমরাই। এমনি করে আত্মবোধের সঙ্গে অপরবোধ (সমাজতত্ত্বে এদের বলা হয় ego এবং alter)-সমন্বিত হয় দৃঢ়-কঠিন ভূমিতে। এই তো ব্যক্তি-মানসের অবলম্বন— শুধু ব্যবহারিক অর্থে নয়, আত্মিক অর্থেও। মানুষের দিকে মানুষের

১. "রসের ধর্ম", শান্তিনিকেতন ২, পৃ. ৪৩

টান যখন স্বার্থপরতা এবং তারই অনুচরবৃন্দের (যেমন, হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা দ্বন্দ্ব ইত্যাদি) দ্বারা নির্মিত কারাকক্ষের দুয়ার ভেঙে বেরিয়ে আসে মুক্তির আলোয় আলোয় তখনই বেজে ওঠে স্বধর্মোন্মেষের শঙ্খধ্বনি। যে ধ্রুব লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে, সে একাধারে স্বধর্ম ও আদর্শ। তাদের সম্বন্ধ খুবই গূঢ় ও গাঢ়। অনেক সময় মনে হয় তারা যদিও ভিন্ন নামধারী, তবুও অন্তরে সদৃশ। অনেকটা তাই বটে। স্বধর্ম ও আদর্শ যুগপৎ পাথেয়, দিগ্‌নির্দেশক এবং লক্ষ্য। কিন্তু বস্তুত তাদের তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন। বোধ হয় এটা বলা অসংগত হবে না যে, আদর্শ উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের 'ভাবরূপ' এবং 'স্বধর্ম' তারই 'ক্রিয়ারূপ'।

চিন্তন বিশ্লেষণাত্মক। তার কাজ ভাঙা ও গড়া, গড়া ও ভাঙা। যা-কিছু আমাদের চেতনার সংস্পর্শে আসে, তারা অখণ্ডরূপেই আসে; নৈয়ায়িকের ভাষায় 'blurred whole'— ভাসা-ভাসা গোটা-রূপ। সেটাকে উলটিয়ে-পালটিয়ে ভেঙেচুরে চিন্তন প্রত্যেক অংশের অর্থ নিরূপণ করে; তার পর সেই ভাঙাচোরা অংশগুলোকে জোড়াতাড়া দিয়ে আদ্যরূপ গড়তে চেষ্টা করে। কিন্তু আদ্য অখণ্ডতা সৃষ্টি করতে পারে না; যেটা সৃষ্ট হয় সেটা বিশ্লেষ্য অর্থবহ সমগ্রতা। চিন্তন তাকে তার জ্ঞানমণ্ডলে (যাকে যুক্তিশাস্ত্রে বলা হয় universe of discourse) ঠিক ঠিক জায়গামত বসিয়ে সুবোধ্য অর্থরসে রসিয়ে তৃপ্ত হয়। এই তো ভাঙা-গড়া গড়া-ভাঙার খেলা— মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য। চিন্তন অক্লান্ত। মস্তিষ্ক সদা-সক্রিয়। D. O. Hebb তাই বলেছেন: "…the human brain is built to be active, and… as long as it is supplied with adequate nutrition will continue to be active."[১]

যতক্ষণ পর্যন্ত রসদ সরবরাহ চলে ততক্ষণ মস্তিষ্কের বিরাম নেই, চিন্তনের কাজ চলছেই। প্রশ্ন ওঠে, রসদজোগানদার কে? কোথা থেকেই বা রসদ সংগৃহীত হচ্ছে?

সংগ্রহের ভার সংবেদনের। বাহির-বিশ্ব সংবেদনের কাছে ধরা দেয়। সংবেদন পঞ্চমুখ। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অবারিত বাহির-বিশ্ব হতে সে অনিবার রসদ সংগ্রহ করে যাচ্ছে চিন্তনের জন্য। সংবেদনকে তাই অন্তর-বাহিরের

১. "Drives and the C. N. S. (Conceptual Nervous System)", *Motivation*, edited by Dalbir Brinda and Jane Stewart : Penguin Books, 1966, p. 67

মধ্যে সেতু বলে চিহ্নিত করা যায়। রক্তকরবীতে রাজার সম্বন্ধে বিশু যে কথা বলেছিল, চিন্তনের বেলাতেও তা প্রযোজ্য : "ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকল রকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।"[১] সে তার চারি দিকে অতি সন্তর্পণে এমন যুক্তিশাস্ত্রের ব্যূহ রচনা করেছে যে, কোনো ফাঁক দিয়ে যেন রসবত্তার তালবেতাল আমেজ না প্রবেশ করে। চিন্তন রসহীন নৈর্ব্যক্তিক নিয়মানুগ জীবন পছন্দ করে; তাই নৃত্যপাগল সংরাগকে তার এত ভয়।

চিন্তনের যুক্তিশাস্ত্রের অন্তরে আছে এক বৈশাখী তাপস। তার মধ্যে তাপহরা তৃষাহরা শ্যামল-সুন্দর রূপ যদি সৃষ্ট নাই হল তা হলে মরুভূমির সঙ্গে মানবজীবনের বিভেদ রইল কোথায়? শ্যামল-শোভন রূপের স্রষ্টা সংরাগ। সংরাগ রসের ভাণ্ডারী। যত মান (value) মানবীয় বলে স্বীকৃত হয়েছে, তাদের আবাস সংরাগের রাজ্যে। তার আওতায় থাকে মানবোধ যা অস্তিত্বের মধ্যে রসসঞ্চার করে, জাগিয়ে তোলে হৃদয়কে। সংরাগের গুরুত্ব কতখানি সেটা Abraham H. Maslow-র উক্তিতে প্রকাশিত : "The Greek respect for reason was not wrong but only too exclusive. Aristotle did not see that love is quite as human as reason."[২]

শুধু চিন্তনকে, শুধু বিচারবুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলেই কি চলে? তার সঙ্গে প্রাণ-তরঙ্গের দোলন কই? 'পঞ্চভূত'-এ স্রোতস্বিনীর কথায় এই মানবিক রসের ধর্ম প্রস্ফুট : "আমি অনাবশ্যককে ভালোবাসি, অতএব অনাবশ্যকও আবশ্যক। অনাবশ্যক অনেক সময় আমাদের আর-কোনো উপকার করে না, কেবলমাত্র আমাদের স্নেহ, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের করুণা, আমাদের স্বার্থবিসর্জনের স্পৃহা উদ্রেক করে; পৃথিবীতে সেই ভালোবাসার আবশ্যকতা কি নাই?"[৩] স্রোতস্বিনী যে-ভাবগুলির উল্লেখ করেছে, তারাই সংরাগের দূত, মনুষ্যত্বের পতাকাবাহক, তারাই মানবচেতনাকে উদ্রিক্ত করে।

---

১. রক্তকরবী, পৃ. ৬৩

২. *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, 1970, p. 8

৩. "পরিচয়", পঞ্চভূত, পৃ. ৮

স্বজ্ঞার বাস অন্তরের গভীরে, অপ্রত্যক্ষতার সীমানায়। কবির কথা দিয়ে যদি শুরু করি, "যে-সকল ভাব, যে-সকল স্মৃতি, মনোবৃত্তির যে-সকল উচ্ছ্বাস সাধারণ লোকের মনে আপন আপন যথানির্দিষ্ট কাজ করিয়া যথাকালে ঝরিয়া পড়ে অথবা রূপান্তরিত হইয়া যায় ..."[১] তবে বলতে পারা যায় তারা আশ্রয় অবচেতনার এলাকায় বিস্মরণের অন্ধকারে। কিন্তু তারা তো সমূলে বিলুপ্ত হয় না। অনুকূল পরিস্থিতির সোনার কাঠি তাদের সহসা জাগিয়ে দেয় : তারা অন্ধকারের আবরণ নিমেষ-মধ্যে ছিন্ন ক'রে, অতীন্দ্রের ভাষায়, "হঠাৎ আলোর ছটার মতো" ছুটে আসে সচেতনতায় জ্ঞেয় রাজ্যে। স্বজ্ঞার প্রধানতম লক্ষণ হল স্বতঃস্ফূর্ততা। তার আবির্ভাবের উপলব্ধি হয় হঠাৎ-পাওয়া ঘুম-ভাঙানিয়া অনুভূতিতে। সহসা যেন সত্তার দুয়ার খুলে যায়, ঋষির উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে : "শৃণ্বন্তু বিশ্বে"। জ্ঞানী বলে ওঠে, 'ইউরেকা, ইউরেকা'। কোন্-এক অনাবিষ্কৃত সত্য, কোন্-এক অনন্বিত তাৎপর্যের হঠাৎ-জাত ভাষ্যের ঝলমলানো ইঙ্গিত চমকে দেয় মনকে। তবে এটাও সত্য যে, তারা যদি তাদের ইচ্ছা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলতে শুরু করে, তখন মানস-মণ্ডলে কালো কালো মেঘ জমতে থাকে। সেটা ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। কিন্তু সাধারণত তা হয় না, কারণ দুটি প্রক্রিয়ার সচল প্রভাব। এই দুটি হল ব্যবচ্ছেদ এবং সমন্বয় ; একদিকে বিখণ্ডীকরণ আর-এক দিকে একত্রীকরণ। এরাই ব্যক্তি-মানসে ভারসাম্য বজায় রাখে। যদি ভারসাম্যে হেরফের হয় তা হলে কী ঘটতে পারে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে Abner Cohen বলেছেন : "When a man fails to achieve such an equilibrium in his own personality, he will lose his selfhood, the oneness of the 'I', and thus become a 'Psychic case' in need of clinical treatment."[২]

ব্যক্তি যখন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তারি সঙ্গে তার আত্মবোধের অবলুপ্তি শুরু হয়, স্বকীয়তা হারিয়ে যায় ব্যবচ্ছিন্ন অস্তিত্বে।

---

১. "পরিচয়", পঞ্চভূত, পৃ. ১৪

২. *Two-Dimensional Man : An essay on the anthropology of power and symbltosm in complex society*, Routledge & Kegan Paul, 1974, p. 55

অতীন্দ্রের স্বভাব এবং স্বধর্মের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করবার জন্য তার চতুর্বৃত্তির ক্রমবিকাশ পর্যালোচনার প্রয়োজন। অতীন্দ্রের চিন্তন-বৃত্তি প্রখর, সংরাগ গভীর, সংবেদন ব্যাপক এবং স্বজ্ঞা চমকে-দেওয়া বিদ্যুতের ঝলক। অতীন্দ্রের বিশ্লেষণ-শক্তি প্রকাশ পায় যখন নিজেকে, দলকে, আদর্শকে, কর্তব্যকে, এমন-কি, এলাকেও (বিশেষ করে এলাকেই) ক্ষুরধার বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে আসে। কোথায় তাদের ভণ্ডামি, ভান-বিলাসিতা, কোথায় তাদের আত্মশক্তি হীনবীর্য, কোথায় তাদের আত্মহত্যা, কেমন করে তারা ভ্রান্ত পণের কঠিন শিকলে বন্দী : অসংখ্য প্রশ্নের আভাস, অনেক উত্তরের ইঙ্গিত, দুরূহ মূল্যায়নের পথে পথে পাথর ছড়ানো।

যদিও চিন্তন সংরাগের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করে, সংরাগ নাছোড়বান্দা। সে চিন্তনের মণিবন্ধে পলাশের কলি বাঁধবেই বাঁধবেই, চিন্তনের চলতি-পথে দুধারে পারুল-বেলা-জুঁই-চাঁপা গাছ কেবলই গন্ধ বিছোয় সারা পথময়। চিন্তনের মধ্যে এক মায়াবী সুর জাগায় সেই গন্ধ। অতীন্দ্রের বেলায় সংরাগ তো অতি-সক্রিয়; তার মনকে রঙিন স্বপ্নে ভরায়, যদিও সে স্বপ্ন শুধু মরীচিকা। তার যুক্তির অন্তরে মাধবীর মধুময় মন্ত্র। এক অপরূপ সহাবস্থান : চিন্তনের দিগন্ত সংরাগের রঙে রঙে রাঙানো। সংরাগের তীব্রতা অনুভূত এলা-অতীন্দ্রের দ্বৈত মানদণ্ডের অন্তর্দ্বন্দ্বে। এই স্নেহ এই বিক্ষোভ, এই প্রেম এই অভিমান, এই যন্ত্রণাবোধ এই আবার স্মৃতিমন্থনের আনন্দ।

অতীন্দ্রের ক্ষেত্রে সংবেদনের সমস্যা জটিল। তার আবাল্য জীবন যে-পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল, সেখানে মানবতার স্বীকৃতি ছিল, রুচি ছিল উর্বর, কর্ম ছিল অর্থপূর্ণ। তার পর যে-পরিবেশে সে এসে পড়ল, সেটা সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে, সংগৃহীত রসদেরও আকার-প্রকারে প্রকাণ্ড বিভেদ। এমনিতেই অজানা পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাওয়ানো প্রয়াস-সাধ্য। তার উপরে পরিবেশ যদি এমন হয় যেটা কল্পনাতেও ভাবা যায় নি, তা হলে সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো অসাধ্যপ্রায় প্রয়াস, বিশেষ করে ব্যক্তি-মানস যখন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। নূতন পরিবেশে সংবেদন যে-রসদ সরবরাহ করছে সেটাতে অতীন্দ্রের রুচি নেই; তার চিন্তন-সংরাগ সে রসদকে খোরাক বলে মেনে নিতে পারছে না। তাই, উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় আদি-পরিবেশে যে ছিল অতীন্দ্রের সাথী— সাহিত্য,

শেষ পর্যন্ত তারই কয়েকটি চিহ্ন বহন করে চলছে তার পলায়নপর গুপ্তচরিষ্ণু জীবনেও, পাছে শেষ পর্যন্ত তার আত্মপরিচয়ের অবশিষ্টাংশও হারিয়ে না যায় আঁস্তাকুড়ের পাঁশতলায়।

স্বজ্ঞার প্রথম প্রকাশ অতীন্দ্র-এলার সাক্ষাতে, স্টীমারে। তার অন্তরে গোপন গভীরে যে-প্রেয়সীর ভাবরূপ চিত্রিত হয়েছিল— এমন প্রেয়সী যে তাকে ডাক দেবে, যার জন্য মন তার ঘুরে ঘুরে ফিরছিল। হঠাৎ দেখা। মন বলে উঠল : এই সেই নারী যার হাতের দীপশিখায় অতীন্দ্রের আত্মপরিচয়ের আলো। এই ঘটনা হতেই ধরে নেওয়া যায় অতীন্দ্রের স্বজ্ঞা অত্যন্ত অনুশীলিত ; সূক্ষ্মতম স্পর্শও তার কাছে ধরা পড়ে। এই পরিশীলিত স্বজ্ঞা এখন শুধু কান খাড়া করে আছে কখন কোন্ দিক থেকে বিপদ হঠাৎ-হাওয়ার মতো হানা দেয়। স্বজ্ঞার বর্তমান কাজ, শুধু কোনোরকমে বেঁচে থাকার জৈবিক স্পৃহা বাঁচিয়ে রাখা। তা ছাড়া আর কী মূল্য আছে অস্তিত্বের ? শিকারী কুকুরের তাড়া খেয়ে হরিণ যেমন করে চলে, তেমনি ভাবে চলা। তাড়িত প্রতারিত দেউলিয়া। কাঁধে শুধু ভূতের বোঝা : তার ভারে দেহ-মন নুয়ে পড়েছে।

অতীন্দ্র-চরিত্রে যেটা সকলের চোখে পড়ে সেটা তার স্বাতন্ত্র্যের বর্ণবৈচিত্র্য। এই "এক বুনোনী" চরিত্রের মানুষটির সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথের গভীর ঔৎসুক্য, কারণ "ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে…" (পৃ. ৩৫)। বটু তাকে ভয় করে, কারণ অতীন "…ওর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতীয় বলে" (পৃ. ৬৮)। এলার কাছে সে "শ্যাওলার মধ্যে শতদল পদ্ম" (পৃ. ৪৮)। অতীন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে কানাই তো স্পষ্টই বলে ফেলল, "তোমাকে দলে জড়িয়ে ইন্দ্রনাথ ভায়া দেশের লোকসান করেছেন" (পৃ. ১৪)। চরিত্রবল, পৌরুষ, ব্যক্তিত্ব, প্রতিভার প্রতিশ্রুতি : স্বভাবের বিভিন্ন দিক দিয়ে অতীন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। এলা যখন বলে : "কারো মতো নও যে তুমি ; মস্ত তুমি" (পৃ. ৫৫) তখন মনে হয় না কথাগুলির মধ্যে কোনো অত্যুক্তি আছে। অনেক গুণের আধার অতীন্দ্র : অলোকসামান্য তার প্রকাশ। কিন্তু চরিত্র-রচনায় বৈশিষ্ট্যে এই অসাধারণতা সত্ত্বেও সে কখনো 'অ-সাধারণ' মানুষ হয়ে ওঠে নি। সাধারণ মানুষের মতো অতীন্দ্র ভুল করেছে : ভুল করে তুষানলের মতো জ্বলেছে : জ্বলন্তে

জ্বলতে অধীর হয়ে মুক্তির আশায় উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়েছে। সে আমাদের কাছে 'অ-সাধারণ' নয়, এক অতি-আপন মানুষ যার সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা আমাদের মনে গভীর সুরে বাজে।

আপাতদৃষ্টিতে এমন একটা ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে অতীন্দ্র 'অ-সাধারণ' না হলেও অনেকটা অপ্রাকৃত। কৌলীন্যবোধ মনীষা মানবিকতা সৌন্দর্যবোধ সত্যানুসন্ধিৎসা : এগুলি তার রুচিবোধের অলংকার, অন্তরের মূলধন। যে-কাজ এই মূলধনের উপরে রাহাজানি করে, মানুষের শ্রেয়োবোধকে দেউলে ক'রে দেয়, অতীন্দ্রের জীবনবাদে সে-কাজ স্বধর্মদ্রোহী। অথচ, আশ্চর্য এই যে, অতীন্দ্রই কিনা এমন এক কর্তব্যের পথে আমরণ চলার পণ প্রাণপণ আঁকড়ে ধরে রইল যে-পথে তার শ্রেয়োবোধ প্রতি মুহূর্তে নির্যাতিত! সন্দেহ জাগে, রবীন্দ্রনাথ হয়তো একটা মতবাদকে প্রমাণ করবার জন্যই তাকে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বেঁধে রেখে দিয়েছেন। ফলে, সেই মতবাদ যত-না প্রমাণিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি আহত হয়েছে অতীন্দ্র-চরিত্র।

অতীন্দ্রের ব্যক্তিত্বে একটা অন্তর্বৈষম্য আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। করবার দরকারও নেই। কারণ, এই অন্তর্বৈষম্যই তার চরিত্রে গতি এনে দিয়েছে। রুচি-প্রবণতা তার স্বভাবের ধর্ম; আবার রুচিধর্মিতাই তাকে রুচি-বিরুদ্ধ পথে টেনে নিয়ে গেছে। স্বভাব-হননের গ্লানি তাকে নিত্য অঙ্কুশবিদ্ধ করেছে : অথচ এমনি করে স্বভাবকে মেরেই সে যেন তার স্বভাবকে নিয়ত রক্ষা করে চলেছে। এই দোটানার কঠিন সংঘাত থেকে উৎসারিত হয়েছে তার অনুভূতির তীব্রতা, ভাবলোকের কালবৈশাখী। অন্তর্বৈষম্যই অতীন্দ্র-চরিত্রের অন্ধ-করা অন্ধকারে পথ-দেখানো আলো : এমন অনুমান করা অসংগত হবে না।

ভাবপ্রবণ অতীন্দ্রের মধ্যে আমরা হৃদয়বৃত্তির ত্রিধারা দেখতে পাই। সে সাহিত্য ভালোবাসে, ভালোবাসে মনুষ্যত্ব, আর ভালোবাসে এলাকে। সাহিত্য তার মনের বিহার-ক্ষেত্র, মনুষ্যত্ব জীবনের আদর্শ। আর, সবার মূলে প্রেরণার উৎস হল এলা : জীবনযাত্রায় এই তিনের সমন্বয় ঘটবে এমন আশা তার ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তারা অবচ্ছিন্নই রয়ে গেল। প্রেম আদর্শ ও প্রৈতি : তারা প্রকাশ পেল পরস্পর-বিরোধী দিকে, বিকৃত পথে। আদর্শের সঙ্গে প্রৈতির মিলন ঘটল না, মিলন ঘটল না প্রৈতির সঙ্গে প্রেমের। ফলে : ছন্নছাড়া জীবনের

অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে এল তার ভাগ্যে। অতীন্দ্রের জীবন যেন হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া নৌকার নিরুদ্দেশ যাত্রা।

এলার কাছে অতীন্দ্র রহস্য ক'রে নিজেকে "কথায়-পাওয়া মানুষ" ব'লে বর্ণনা করেছে। সে কথা ভালোবাসে। ভালোবাসে তার মনের ছবিকে কথা কওয়াতে। শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে অতীন্দ্র বলে, "যখন আমার বয়স অল্প, ভালো করে মুখ ফোটে নি, তখন সেই মৌনের অন্ধকারের ভিতর থেকে কথা ফুটে ফুটে উঠছিল, কত উপমা কত তুলনা কত অসংলগ্ন বাণী" (পৃ. ৬৪)। জ্ঞানোন্মেষ থেকে শুরু করে এই যেন তার জগৎ, কথার জগৎ: আপন মনের রঙে রসে কল্পনায় উপমায় রচিত এক সুন্দর সৃষ্টি। এমন এক ভাবাত্মক মন নিয়ে বড়ো হয়ে অতীন্দ্র যখন সাহিত্যলোকে প্রবেশ করল সেখানে সে যেন আপন ঈপ্সিত রাজ্যের সন্ধান পেল। সে দেখল: "...ইতিহাসের পথে পথে রাজ্যসাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ, দেখলুম বীরের রণসজ্জা পড়ে আছে ভেঙে, বিদীর্ণ জয়স্তম্ভের ফাটলে উঠেছে অশথগাছ; বহু শতাব্দীর বহুপ্রয়াস ধুলার স্তূপে স্তব্ধ। কালের সেই আবর্জনারাশির সর্বোচ্চে দেখলুম অটল বাণীর সিংহাসন। সেই সিংহাসনের পায়ের কাছে যুগযুগান্তরের তরঙ্গ পড়ছে লুটিয়ে লুটিয়ে" (পৃ. ৬৪)। একদিকে ইতিহাসের ভঙ্গুর পৃথিবী: আর-এক দিকে সাহিত্যের অবিনশ্বর অমরাবতী। কালের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের ক্রমবিকাশ সম্ভব। অথচ, যা-কিছু কাল-নির্ভর তার ক্ষয় অনিবার্য। জীবন যৌবন ধনমান; কী জাতিগত কী ব্যক্তিগত: সবই তো কাল-সমুদ্রের ভেসে-চলা প্রবাহ। আজকের বিরাট কীর্তি: কাল সে অশথ-ছায়া-ঢাকা ভগ্নস্তূপ। কালের প্রভাব কাটিয়ে যা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে একমাত্র তার সত্তাই হল শাশ্বত অবিনাশী। কালাতীত বলেই সেই সত্তা ইতিহাসের ঘটনা-প্রবাহ নয়। সাহিত্যই হল মানুষের সেই কালজয়ী প্রয়াস। তাই দেখা যায়, কত সিংহাসন গড়া হল কত ভাঙল। কিন্তু বাণীর সিংহাসন অক্ষয় অমর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালসমুদ্রের তীরে। কালস্রোত যেন যুগযুগান্তরের তরঙ্গ দিয়ে সেই সিংহাসনের পদতল ধুইয়ে দিয়ে বয়ে চলেছে। মন চায় এমন সত্য যা ধ্রুব যা ধ্বংসলীলার ঊর্ধ্বে। কালাশ্রয়ী পরিবর্তমান ইতিহাসে সে সত্যের সন্ধান নেই, আছে কালজয়ী সাহিত্যে। অতীন্দ্রের কাছে লৌকিক সংজ্ঞা দিয়ে

সাহিত্য পরিসীমিত নয়। সত্য-শিব-সুন্দর -বোধের অবিনশ্বর বাণীমূর্ত রূপ হল সাহিত্য। সাহিত্যলোকে তাই সে খুঁজেছিল তার জীবনসাধনার লক্ষ্য। এ কথা প্রকাশ পায় অতীন্দ্রের একদা-লালিত আশায়: "কতদিন কল্পনা করেছি সেই সিংহাসনের সোনার স্তম্ভে অলংকার রচনা করবার ভার নিয়ে এসেছি আমিও" (পৃ. ৬৪)।

সাহিত্যানুরাগ অতীন্দ্রের মনে যে কত গভীরে ঠাঁই পেয়েছে তার আভাস পাওয়া যায় তৃতীয় অধ্যায়ে। ভুতুড়ে পাড়ায় পরিত্যক্ত পুরোনো দালানে অজ্ঞাতবাস-কালে তার নিঃসম্বল নির্বান্ধব ফেরারী জীবনের সঙ্গী শুধু কয়েকটি বই: "কাব্য, তার কিছু ইংরেজি, আর দুই-একখানা বাংলা।" ভ্রষ্ট জীবনের শেষ অঙ্কে পৌঁছেও অতীন এগুলির সাহচর্য ছাড়তে পারে নি তার কারণ: "...পাছে নিজের জাত ভুলি। ওরই বাণীলোকে ছিল আমার আদি বসতি। পাতা খুলতেই পেন্সিলে চিহ্নিত তার রাস্তাগলির নির্দেশ পাবে। আর আজ" (পৃ. ৮২)। চেনা জগৎ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সে কর্মজীবনের যে-জগতে এসে পড়েছে সেটা তার কাছে অচেনা অদ্ভুত অকাম্য। সেখানে সে সত্যিই misfit।

এমন জগতে অতীন কেমন করে এসে পড়ল সে উত্তর মেলে তার প্রেমের ইতিহাসে। সাহিত্যিক ছাঁচে-ঢালা রোমান্টিক মন তার। যে-চোখ দিয়ে জগৎকে সে দেখেছিল তাতে রঙ ছিল: সাহিত্যের রঙ রোমান্সের রঙ। এলাও সেই রঙে রঙিন। "প্রহরশেষের আলোয় রাঙা" এক চৈত্রদিনে প্রথম যখন এলা তার জীবনে আবির্ভূত হল, সে এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা: যেন ভাগ্যলক্ষ্মী সৌন্দর্যের এক আশ্চর্য দান নিয়ে সহসা তার সামনে এসে দাঁড়াল। এমন "...অপরিসীম ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে কথা এর আগে ও [অতীন্দ্র] কখনোই সম্ভব বলে ভাবতে পারে নি, কেবল তার কল্পরূপ দেখেছে কাব্যে ইতিহাসে; বারে বারে মনে হয়েছে দান্তে বিয়াত্রিচে নূতন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে" (পৃ. ৭৬)। তার প্রেম এবং বিপ্লবী জীবনের সূচনায় ছিল এই সাহিত্যিক নজিরের ইঙ্গিত।

প্রথম দর্শনেই প্রেমের উন্মেষ। অতীন্দ্র একা বসে ছিল খেয়া-স্টীমারের ফার্স্ট ক্লাস ডেক-এ বেতের কেদারায়— গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পাট-করা মুগার চাদর কাঁধে। এলা তখন জনসাধারণের দলে, ডেক-প্যাসেঞ্জার। সেই

দিনটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবার প্রয়াসে অতীন্দ্র বলে : "হঠাৎ আমার পশ্চাদ্‌বর্তী অগোচরতার মধ্যে থেকে দ্রুতবেগে এসে পড়লে আমার সামনে। আজ চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙের শাড়ি ; খোঁপার সঙ্গে কাঁটায় বেঁধা তোমার মাথার কাপড় মুখের দুই ধারে হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। চেষ্টাকৃত অসংকোচের ভান করেই প্রশ্ন করলে, "আপনি খদ্দর পরেন না কেন" (পৃ. ৪৭)। এলার গলার স্বর শুনেই অতীন্দ্রের "...সর্বশরীর চমকে উঠল, সেই সুর আমার মনের মধ্যে এসে লাগল হঠাৎ আলোর ছটার মতো ; যেন আকাশ থেকে কোন্ এক অপরূপ পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে" (পৃ. ৪৭)। অতীন্দ্রের কথাগুলি তার অন্তর্বিপ্লবের এক মুখর বর্ণনা। এলার আবির্ভাব যেন তার চিরপরিচিত অস্তিত্বকে মুছে ফেলে দিল। হঠাৎ-পাওয়ার আকস্মিকতায় তার 'পশ্চাতের আমি' যেন হারিয়ে গেল চিরতরে। শৌখিন বিলাসী অভিজাত অতীন্দ্র তার কাপড়ের তোরঙ্গ দেশব্রতী এলার পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল। আর, সেইসঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎকেও। পরিহাসচ্ছলে এলাকে অতীন্দ্র বলেছে : "অপরিচিতা মেয়েটির অভাবনীয় স্পর্ধায় যদি রাগ করতে পারতুম তা হলে সেদিনকার খেয়াতরী এতবড়ো আঘাটায় পৌঁছিয়ে দিত না— ভদ্র পাড়াতেই শেষ পর্যন্ত দিন কাটত চলতি রাস্তায়" (পৃ. ৪৭)।

অন্তর্বিপ্লবের প্রণোদনায় অতীন্দ্র পা বাড়াল রাষ্ট্রবিপ্লবের পথে। সে এলাকে চেয়েছিল একান্ত করে পেতে : "তোমার সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলুম এইটে অত্যন্ত সহজ কথা। দুর্জয় সেই লোভ। প্রচলিত পথটা ছিল বন্ধ। মরিয়া হয়ে জীবন পণ করলুম বাঁকা পথে। তুমি মুগ্ধ হলে" (পৃ. ৬৩)। প্রচলিত পথে ঈপ্সিত মানুষটিকে যখন সম্পূর্ণ করে পাওয়া অসম্ভব ব'লে মনে হল তখন না-পাওয়ার অভাবটাকে সে পূর্ণ করতে চাইল এলার সান্নিধ্য দিয়ে। সহধর্মিতার মিলনবন্ধনের পরিবর্তে শুধু সহকর্মিতার বন্ধনহীন গ্রন্থি। সামান্য এই সাহচর্যের পাওয়া। কিন্তু এইটুকু দিয়েই তার কবিমন স্বর্ণপ্রতিমা গড়েছে শূন্য মন্দিরে, আসন লাভ করেছে কল্পনায় : "তোমার এই ছিপ্‌ছিপে দেহখানিকে কথা দিয়ে দিয়েই মনে মনে সাজিয়েছি, তুমি আমার সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, তুমি আমার সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা" (পৃ. ৬৫)। এই বিদেহী পাওয়া একদিকে যেমন তার মন ভরিয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছে, অন্য দিকে তেমনি তার না-পাওয়ার

বেদনাকে তীব্রতর করে তুলেছে। না-পাওয়ার মূলে আছে এলার পণ। তার ক্ষোভের আগুন সেই পণকে দহন করেছে অবিরাম। তবুও তার অশান্ত অন্তর কিছুতেই ভুলতে পারে না: "আমি ভেঙেছি আমার স্বভাবকে, কুসংস্কারে অন্ধ তুমি ভাঙতে পারলে না তোমার পণকে, যার মধ্যে সত্য ছিল না" (পৃ. ১০৪)।

অতীন্দ্র যদি বিশ্বাস করতে পারত যে পণ গ্রহণের মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা আছে, সত্য আছে, তবে হয়তো সে একটা আপস করে নিত। তার জীবনবাদ বলে: নারীর ধর্ম ভালোবাসা। যে-পণ ভালোবাসার পরিপন্থী, সে তো স্বধর্ম-নাশক। আর, স্বধর্ম-নিধনের মধ্যে আছে নীতিব্রাত্যতা। ব্রত যদি এমন হয় যে, তার উদ্‌যাপনের জন্য ভালোবাসার অস্বীকার বা উচ্ছেদ প্রয়োজন, তবে নারীর কাছে সেই ব্রত স্বধর্মবিরোধী। ভালোবাসা-বর্জিত কর্তব্যানুষ্ঠানের আয়োজন আত্মদ্রোহিতার নামান্তর। তেমন আয়োজন প্রারম্ভেই আত্ম-অভিশপ্ত। শুধু তাই নয়। সেই ব্রত মানবতা-বিমুখ। মানুষে মানুষে মিলন ঘটানোই মানুষের ধর্ম। ভালোবাসা হল মন-মিলানো শক্তি। ক্ষুব্ধ রিক্ত বিপ্রলব্ধ অতীন্দ্র তাই এলাকে ধিক্কার না দিয়ে পারে না: "অধার্মিক তোমার পণগ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্মবিদ্রোহ।" (পৃ. ৪৮)

নারীধর্ম সম্বন্ধে এলা-অতীন্দ্রের ধারণা ভিন্নমুখী। এলা মনে করত মেয়েদের ভালোবাসা স্বভাবসংকীর্ণ। তারা কেবলই ক্ষুদ্র সংসারগণ্ডির মধ্যে পুরুষকে বেঁধে রাখতে চায়। অথচ, পুরুষের ধর্মই হল কর্মক্ষেত্রের বিরাট পরিসরের মধ্যে পৌরুষ প্রতিষ্ঠার সাধনা। এলা বলে: "সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় তার শ্রেষ্ঠতা" (পৃ. ৫৫)। সুতরাং নারীর ভালোবাসা পুরুষের আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক। নিঃস্বার্থ এলা অতীন্দ্রকে আপন আত্মকেন্দ্রিক চাওয়া-পাওয়ার নাগপাশ থেকে মুক্ত রেখেছে, তাকে দেশের কাজে এগিয়ে দিয়েছে নিঃসংকোচে। কারণ দেশের বিরাট কর্মক্ষেত্রের অবাধ প্রসারে অতীন্দ্রের অলোক সামান্য ব্যক্তিত্বপূর্ণ সত্তা প্রকাশ লাভ করবার সুযোগ পাবে এই দৃঢ় বিশ্বাস তার ছিল। এ ধরনের যুক্তি অতীন্দ্রের কাছে শুধু ভ্রান্ত তা নয়, অপমানকরও বটে। এলার মনোভাবের মধ্যে এমন একটা তদারকী প্রবৃত্তি, একটা অভিভাবকত্ববোধের আভাস পাওয়া যায় যেটা তার পৌরুষকে আহত করে। পুরুষ জানে কোন্‌টা তার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ। যে-পুরুষ তা না জানে, নির্দিষ্ট পথে চলার ক্ষমতা

যে-পুরুষের নেই, সে 'পুরুষ' নামেরই অযোগ্য : "যেখানে পুরুষের পৌরুষ দুর্বল সেখানেই মেয়েরা নেবে আসে আর নাবায় নীচতার দিকে" (পৃ. ৫৭)। পুরুষের জীবনে নারীর ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ কত সক্রিয় তার বর্ণনা দিয়ে অতীন্দ্র এলাকে বলেছে : "যথার্থ পুরুষ যারা তারা যথার্থ মেয়ের জোরেই চরিতার্থ হবে— বিধাতার নিজের হাতের এই হুকুমনামা আছে আমাদের রক্তে। যে সেই বিধিলিপিকে ব্যর্থ করে সে পুরুষ নামের যোগ্য নয়" (পৃ. ৫৮)। তার মতে—

"…নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান ॥"

—"স্পর্ধা", মহুয়া

নারী সম্বন্ধে অতীন্দ্রের একটা সহজাত সংকোচ আছে; কারণ, "বংশগত ধারণা, ছেলেবেলা থেকে রক্তে মাংসে জড়ানো। বরাবর ভেবে এসেছি মেয়েদের দেহে মনে একটা শুচিতার মর্যাদা আছে; তাদের দেহের সম্মানকে সশঙ্কচিত্তে রক্ষা করা আমাদের পূর্বপুরুষগত অভ্যাস" (পৃ. ৮৭)। এক দিনের ঘটনা উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এলা নারায়ণী ইস্কুলের খাতা নিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিল। অতীন্দ্র যে "মার-খাওয়া-মন" নিয়ে তার কাছে এসেছে, বসে আছে উন্মুখ আশায়; এলা সেটা উপেক্ষা করে তার কাজই করে যাচ্ছিল। সেদিনের কথা উল্লেখ করে অতীন্দ্র অভিমানভরে বলেছে : "মুখ তুলে চাইলে না।… দরদ লাগল না তোমার কোনোখানেই; কৃপণ, সেটুকুও দিতে পারলে না! মনে মনে বললুম, আরো বেশি দাম দিতে হবে বুঝি" (পৃ. ৮৬)। অনুতপ্ত এলা উত্তর দিল : "এটুকু না চেয়ে নিতে পারলে না? কেড়ে নিলে না কেন আমার খাতা। বুঝতে পারো না, তোমারই সংকোচ আমাকে সংকুচিত করে" (পৃ. ৮৭)। অতীন্দ্র প্রতিবাদে বলে : "আমি শিখি নি তেমন করে চাইতে। ক্ষুধার সীমা নেই, তাই বলে পেটুক হতে পারব না, ওটা আমার ধাতে নেই। আমার কামনার কৌলীন্য নষ্ট করতে পারি নে।"

"পূর্বপুরুষগত অভ্যাস", "কামনার কৌলীন্য" ইত্যাদি কি অতীন্দ্রের orthodox বা সনাতনী মানসের অভিব্যক্তি? ঠিক তা নয়। ভালোবাসার মধ্যে দেহজ কামনার প্রভাব অতীন্দ্র তো কোথাও অস্বীকার করে নি। বরং সে নিঃসংকোচে স্বীকার করেছে : "ভালোবাসা তো বর্বর! তার বর্বরতা

পাথর ঠেলে পথ করবার জন্যে। পাগ্‌লা-ঝোরা সে, ভদ্রশহরের পোষ-মানা কলের জল নয়" (পৃ. ৬৫)। অতৃপ্ত বাসনার কশাঘাতে জর্জর হয়ে অতীন্দ্র খেদোক্তি করেছে: "যৌবন যখন প্রথম এসেছিল তখনো মেয়েদের চিনি নি। কল্পনায় তাদের দুর্গম দূরে রেখে দেখেছি প্রমাণ করবার সময় বয়ে গেল যে; তোমরা যা চাও তাই আমি। অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম। সময় যদি না হারাতুম এখনই তোমাকে বজ্রবন্ধনে চেপে ধরতুম, তোমার পাঁজরের হাড় টনটন করে উঠত; তোমাকে ভাববার সময় দিতুম না, কাঁদবার মতো নিশ্বাস তোমার বাকি থাকত না, নিষ্ঠুরের মতো টেনে নিয়ে যেতুম আপন কক্ষপথে" (পৃ. ৬৬)। এই যে পাগ্‌লা-ঝোরা Passion: এ তো একটা সহজাত মনোবৃত্তি, ভালোবাসাকে উর্বর শ্যামল-সুন্দর করে তোলাই তার প্রবণতা। কিন্তু তাই বলে ভালোবাসায় যে কেবল দেহের প্রাধান্য তা নয়। প্রেম যেমন দেহহীন নয়, তেমনি আবার দেহসর্বস্বও নয়। দেহের অন্দরমহলে যে-মন আছে প্রকৃত-পক্ষে প্রেম সেই মনকে খুঁজে ফেরে। দেহের মূল্য আছে, তার কারণ দেহ একটি বিশিষ্ট মনের আধার। যেখানে ভালোবাসা অঙ্গের আঙিনায় ঘুরে বেড়ায়, অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে না, তার আকৃতি পালটে যায়, সে স্বকীয় অর্থ হারিয়ে ফেলে। তখন সে ভোগবাসনায় ক্লেদাক্ত। বটুর মতো মাংসপ্রধান চরিত্রেই তার প্রকাশ। দেহের সার্থকতা প্রস্ফুট হয়ে ওঠে ভালোবাসার দৈবস্পর্শে। যখন সে স্পর্শ লাগে প্রিয়জন বলে ওঠে: "আজু মঝু দেহ ভেল দেহ।" ব'লে ওঠে: "অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল / অরূপ ফুলে॥" এমনি এক বিশ্বাসের উপরেই অতীন্দ্রের প্রেমের প্রতিষ্ঠা; এমনি এক প্রতীতিই তার কামনা-কৌলীন্যের নিয়ন্তা। দেবতা যেমন জোর ক'রে অর্ঘ্য দাবি করে না, তেমনি প্রেমিকের দাবিতেও উগ্রতার প্রকাশ নেই। প্রেমিক গভীর আশায় বেদনায় প্রতীক্ষা করে, কবে পাবে অর্ঘ্যের নিবেদন। অতীন্দ্রের মুখে যখন শুনি: "বসে বসে একদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ইচ্ছা করছিলুম ওই সুকুমার আঙুলগুলির ডগা দিয়ে স্পর্শসুধা পড়ুক ঝরে আমার দেহে মনে" (পৃ. ৮৬) তখন সহজেই অনুমান করা যায় দেহ তার কাছে মাংসের সীমানা পেরিয়ে অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে যেখানে আছে অনন্ত প্রাণস্পর্শের সম্মান অমৃতের সন্ধান।

দেহের মাঝে দেহাতীতকে পাওয়া, রূপের রেখার সঙ্গে রসের রেখার মিলন-

সাধন: এই তো প্রেমের ধর্ম আর এই তার অলৌকিক বিপ্লবী শক্তির উৎস। **Platonic Love** বলতে যা বোঝায়, এ তা নয়। প্লেটনিক প্রেমে দেহের স্থান নেই, দেহ তার কাছে অপবিত্র। কিন্তু যথার্থ প্রেম দেহকে অপবিত্র ব'লে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ফেলে দেয় না। ভাবের রঙে রসে রাঙিয়ে তুলে তাকে অর্ঘ্যের মর্যাদা দান করে। দেহ তখন হয় বীণাযন্ত্র: প্রকৃত প্রেমিকের আঙুলের স্পর্শে সে ঝংকার দিয়ে ওঠে সুরে লয়ে তানে।

এই প্রসঙ্গে 'শেষের কবিতা'র অমিত এবং অতীন্দ্রের প্রেমের একটা তুলনা করা যেতে পারে। দুজনেই রোমান্টিক, কবিধর্মী; দুজনেই কথা দিয়ে সাজিয়েছে তাদের কল্পলোক যেখানে তারা প্রিয়াকে অবিরাম সৃজন করে চলেছে। কিন্তু অমিতের প্রিয়া-সৃজন একেবারে আইডিয়ার রাজ্যে। অতীন্দ্র চেয়েছে আইডিয়া ও বাস্তবের সমন্বয় ঘটাতে। অতীন্দ্রের কাছে এলা যেন **Wordsworth**-এর **Skylark: "True to kindred points of Heaven and Home"**, যে স্বর্গকেও চায়, মর্ত্যকেও চায়। এই স্বর্গ-মর্ত্য মিলনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তার এলা। কিন্তু অমিতের কাছে লাবণ্য সত্যিই "দেহ-হীন চামেলির লাবণ্য-বিলাস"— যে **Shelley**-র **Skylark**-এর মতো **"unbodied joy"**। 'ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি' অমিত লাবণ্যকে সম্পূর্ণ করে গ্রহণ করতে পারে নি বলেই বাস্তবের সংঘাতে অমিতের প্রেম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। প্রেম ও প্রয়োজন, সরোবর আর ঘড়ার জল: এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটল না। কিন্তু অতীন্দ্র এলাকে সম্পূর্ণ করে চেয়েছিল, বাস্তবের মাঝে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল; প্রেম ও প্রয়োজনের মাঝে যে অসামঞ্জস্য বা বিরোধিতা থাকতে পারে সে কথা তার জীবনবাদ স্বীকার করে নি। অমিতের তুলনায় অতীন্দ্রের প্রেম পূর্ণাঙ্গ, সমন্বয়ধর্মী। হয়তো এ কথা বলা আরো যুক্তিসংগত হবে যে, ভাবের দিক থেকে অতীন্দ্রের প্রেম যে পূর্ণতা লাভ করেছিল বাস্তবে তাকে রূপায়িত করবার সুযোগ এল না তার জীবনে। অন্য দিকে অমিতের জীবনে সুযোগ এসেছিল, কিন্তু অমিত সে সুযোগ গ্রহণ করে নি। তার কারণ, অমিতের সত্তা দ্বিধা-বিভক্ত; তার কাছে স্বর্গ স্বর্গই, মর্ত্য মর্ত্যই— তাদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই। **The ideal** এবং *the* **real**: এ দুটোর মধ্যে সমন্বয় করতে সে পরাঙ্মুখ।

তার বিফলবাসনারাশির জন্য অতীন্দ্র দায়ী করেছে এলাকে। তাই এলার

উপর তার দুর্জয় অভিমান। যখনই এলা ঐহিক জিনিস দিয়ে তার শূন্যতা ভরাতে চেয়েছে, সে প্রত্যাখ্যান করেছে নির্মম কঠোরতায়। অতীন্দ্রের দৈন্যদশা দেখে এলা অনুতপ্ত। সে মিনতি করে বলেছে : "দোহাই তোমার, বারবার দোহাই দিচ্ছি, কথা রাখো, আমার কাছে টাকা নিতে সংকোচ কোরো না। জানি তোমার খুবই দরকার" (পৃ. ৮৫)। কিন্তু অভিমান-ক্ষুব্ধ অতীন্দ্র কিছুতেই ভুলতে পারে না : "যে-চাওয়া নিয়ে অসংকোচে তোমার কাছে হাত পাততে পারি তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে তুমি পণের বাঁধ বেঁধেছ" (পৃ. ৮৬)। সুতরাং এখন হাত পেতে কিছু নেওয়া এলার কাছ থেকে ভিক্ষে নেবারই নামান্তর। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এলা যখন অনুনয় করে : "আবার বলছি অন্তু, কিছু নাও আমার হাত থেকে— নাও আমার এই গলার হার" তখনো অতীন্দ্রের প্রত্যাখ্যান অটল : "কিছুতেই না।" সে জানায় : "এমন দিন ছিল তখন যদি দিতে পরতুম গলায়— আজ দিলে পকেটে, অন্নাভাবের গর্তটার মধ্যে। ভিক্ষে নেব না তোমার কাছে" (পৃ. ৯৬)। এই দুর্জয় অভিমান কেবলমাত্র সাহায্যের সীমানায় আবদ্ধ নয়। এমন-কি, সামান্যতম সেবা-গ্রহণেও পরাঙ্মুখ। অতীন্দ্রের পরিহিত ছেঁড়া জামাটার সামনে অপটু হাতের সেলাই দেখে এলা বলে : "আমাকে দিলে না কেন।" অতীন্দ্রের ব্যঙ্গোক্তি : "নব যুগের সংস্কারভার নিয়েছ, তার উপরে পুরোনো জামার সংস্কার ?"

এলার দেওয়া ঐহিক উপহারগুলি প্রত্যাখ্যান ক'রে অতীন্দ্র না-হয় আপনার আত্মসম্মানকে বাঁচাল। কিন্তু যখন এলা নিজেকে তার হাতে তুলে দিতে চাইল, তখন কেন সে তাকে প্রত্যাখ্যান করল ? তার গুমোট জীবনে আলোবাতাস বলতে যদি কিছু থাকে সে তো এলা। তবু, এলা যখন তার পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে মিনতি জানায় : "নাও আমাকে তোমার সঙ্গিনী ক'রে", অতীন্দ্র কেন তাকে এড়িয়ে যায়, কেন বলে : "লোভ দেখিয়ো না এলা। অনেকবার বলেছি আমার পথ তোমার নয়" (পৃ. ৯৬)— এ কি অভিমান ? এ কি অহংকার ? কিংবা আরো গভীর কিছু ? অতীন্দ্র মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সে সত্য কথাই বলছে যখন সে এলাকে বলে : "আমার পথ তোমার পথ নয়।" অতীন্দ্রের পথ অন্ধকারের পথ। সে পথে আছে বিকৃতি : "...বড়োনামওয়ালা বড়োছায়াওয়ালা বিকৃতি" (পৃ. ৯০)। তাদের সংস্পর্শে সুন্দর হয় অসুন্দর, সত্য হয় বিকলাঙ্গ, শিব হারায় তার সুষমা। এলা অতীন্দ্রের ভালোবাসার ধন। তার জীবনে যা-কিছু

শুচি-শুভ্র যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু সত্য এখনো অবশিষ্ট আছে, এলা তারই প্রতিভূ। পবিত্রতার এই শেষ নিদর্শনকেও আপন ক্লেদাক্ত কক্ষপথে টেনে এনে কলুষিত করবে নিজের হাতে? অতীন্দ্রের পক্ষে তা অসম্ভব। তার পথ যদি ধর্মের হত বিপদসংকুল হলেও সে পথে এলাকে সহধর্মিণী ক'রে নিয়ে যেত নিঃসংকোচে। কিন্তু যেখানে বিকৃতি, যেখানে স্বধর্মনাশের অভিশাপ, সেই পথে প্রিয়জনকে সহধর্মিণী করা চলে না। তাই এলাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে অতীন্দ্র বাঁচাতে চাইল এলার শুচিতাকে— এক কথায় তার প্রেমকে। এইটুকুই যে তার শ্রেয়োবোধের শেষ আশ্রয়, তার স্বভাবের শেষ মূলধন।

Coleridge-এর "Ancient Mariner"-এর সঙ্গে এক জায়গায় যেন অতীন্দ্রের মিল আছে। পাপবিদ্ধ বিবেকবোধের কশাঘাতে সে-ও জর্জর। সে হত্যা করেছে স্বভাবকে, বিসর্জন দিয়েছে স্বধর্মকে : এই তার ক্ষমাহীন পাপ, এই তার অবিস্মরণীয় গ্লানি। দুঃসহ গ্লানিবোধ যেন অতীন্দ্রের গলায় হাঁপ-ধরানো ফাঁসের মতো জড়িয়ে আছে। এই গ্লানির কথা বার বার ব'লে অতীন্দ্র হয়তো ফাঁসটাকে একটু আলগা করতে চায়, একটু যেন নিশ্বাস নিতে পারে।

মাঝে মাঝে মনে হয় এই গ্লানিবোধ তার একটা মানসিক ব্যাধি। আত্মনিন্দা তার চেতনার গভীরে যেন obsession-এর আকার নিয়েছে। এলার মনেও সে কথা জাগে। তাই আত্মনিন্দাপ্রবণতার নিন্দা ক'রে এলা অতীন্দ্রকে সস্নেহে সান্ত্বনা দেয়, "অন্তু, আত্মনিন্দা বাড়িয়ে তুলছ কল্পনায়। নিষ্কামভাবে যা করেছ তার কলঙ্ক কখনোই লাগবে না তোমার স্বভাবে" (পৃ. ১০৬)। কিন্তু এই প্রবোধবাক্য অতীন্দ্রের কাছে অর্থহীন। যার ব্যক্তিত্বের মূলধন ছিল স্বভাবের গৌরব, স্বভাব-হননের গ্লানি তার কাছে অসহনীয় বেদনা: "স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারি নি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে" (পৃ. ১০৬)। আপন আরব্ধ কর্মের ইতিহাস সমীক্ষণ ক'রে অতীন্দ্রনাথ শুধু একটি জিনিস দেখতে পায়। সে স্বভাবহন্তা সে স্বধর্মনাশী।

অতীন্দ্রের আদর্শের মূল কথা হল বৈচিত্র্যপূর্ণ আত্মশক্তি। সুন্দর-অসুন্দর, সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়, শিব-অশিব : এদের ভেদাভেদজ্ঞান এবং সত্য-সুন্দর-শিবের পথ অনুসরণ করবার শক্তি। এরাই হল আত্মশক্তির প্রাণ। সেই শক্তি

ভয়ে হার মানে না, পীড়নে নত হয় না। "পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে" মরে তবু "তুড়ি মেরে উপেক্ষা" করে "সেই হৃদয়হীন দেয়ালটাকে।" যে উপায়-বিহীন তাকেও আত্মশক্তি প্রেরণা জোগায় শক্তিমানের বিরুদ্ধে লড়বার, দুর্বলকেও সম্মান দেয় সবলের সমকক্ষ হবার। সে লড়াই সাহসের লড়াই, কাপুরুষতার নয়। আত্মশক্তির প্রেরণাতেই মানুষ বলতে পারে: "আমি ভয় করব না ভয় করব না।" মুক্তিসংগ্রামের চারণ-কবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গানের কথা মনে পড়ে: "ফুলার, আর কি দেখাও ভয়? / দেহ তোমার অধীন বটে / মন তো অধীন নয়।" এই-যে আত্মার স্বাধীনতা, শত পীড়নেও যার পরাজয় নেই: তার নৈতিক শক্তির কাছে অন্যায়কারীর পাশব শক্তি মাথা নোওয়াবে: "যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।" এই মৌলিক বিশ্বাসের উপর অতীন্দ্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই-তার মুখে শুনতে পাই: "নিশ্চিত জানতুম আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে, রেগে বিদ্রূপ করবে; তবু ওদের বলেছি, অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হলেও তাতে হার, পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্মে বড়ো— নইলে এত বড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন। নির্বুদ্ধিতার আত্মঘাতের জন্যে?" (পৃ. ৯২)

মানবধর্মীর কাছে দেশের একটা বিশিষ্ট সংজ্ঞা আছে। এই সংজ্ঞার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে: "মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে। যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ। বহুলোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল। যে-সব দেশবাসী অতীতকালের তাঁরা বস্তুত বাস করতেন ভবিষ্যতে। তাঁদের ইচ্ছার গতি কর্মের গতি ছিল আগামীকালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যৎ আজ বর্তমান হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু আবদ্ধ হয় নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করছি। সেই ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিগতরূপে আমরা ভোগ করব না। যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই রচনা। তাঁদেরই

স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান; বুঝেছে যে, তার দৃষ্টি, তার সৃষ্টি, তার চরিত্র, মৃত্যুকে পেরিয়ে। মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে যাঁরা অমৃতকে প্রমাণ করেছেন তাঁদের দানেই দেশ রচিত। ভাবীকালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিবর্ণনির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই প্রমাণ করেন, সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম ক'রে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে। অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে— যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে।"[১]

মানুষ যেখানে খণ্ড বিভিন্ন অবচ্ছিন্ন সেখানে সে দেহের জীব। দেহের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে সকল মানুষের দিকে ধাবিত হওয়া : এই হল আত্মার সাধনা। ভৌমিক সীমায় আবদ্ধ দেশ ক্ষুদ্র খণ্ড বিচ্ছিন্ন। দেশের আত্মার সাধনা এই ক্ষুদ্রতা খণ্ডতার ভৌমিক সীমানা পার হয়ে "সকল কালের সকল মানুষকে" লাভ করা। অতীন্দ্রের দেশপ্রেম এমনি এক মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তাই প্রচলিত অর্থে patriot বলতে যা বোঝায় সে তা নয়। অতীন্দ্র বলে "আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে, তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বল আমি সেই পেট্রিয়ট নাই। পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম্ কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকো।" (পৃ. ৯৪)

"...পেট্রিয়টিজ্‌ম্ কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকো।"— এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় সত্তর দশকের একজন স্বদেশ-বিতাড়িত বিশ্ববন্দিত সাহিত্যকারের কথা। তাঁর স্বদেশপ্রেমের ধারণা সম্বন্ধে আলোচনাকালে Stephen Carter লিখেছেন: "...Patriotism, in the form of a profound love for one's native country, as opposed to any mitiary jingoism, is for Solzhenitsyn an inspiration to creative literature and appreciation of beauty. As such it can be

১. 'মানুষের ধর্ম', র-র ২০, পৃ. ৩৭৯-৮০

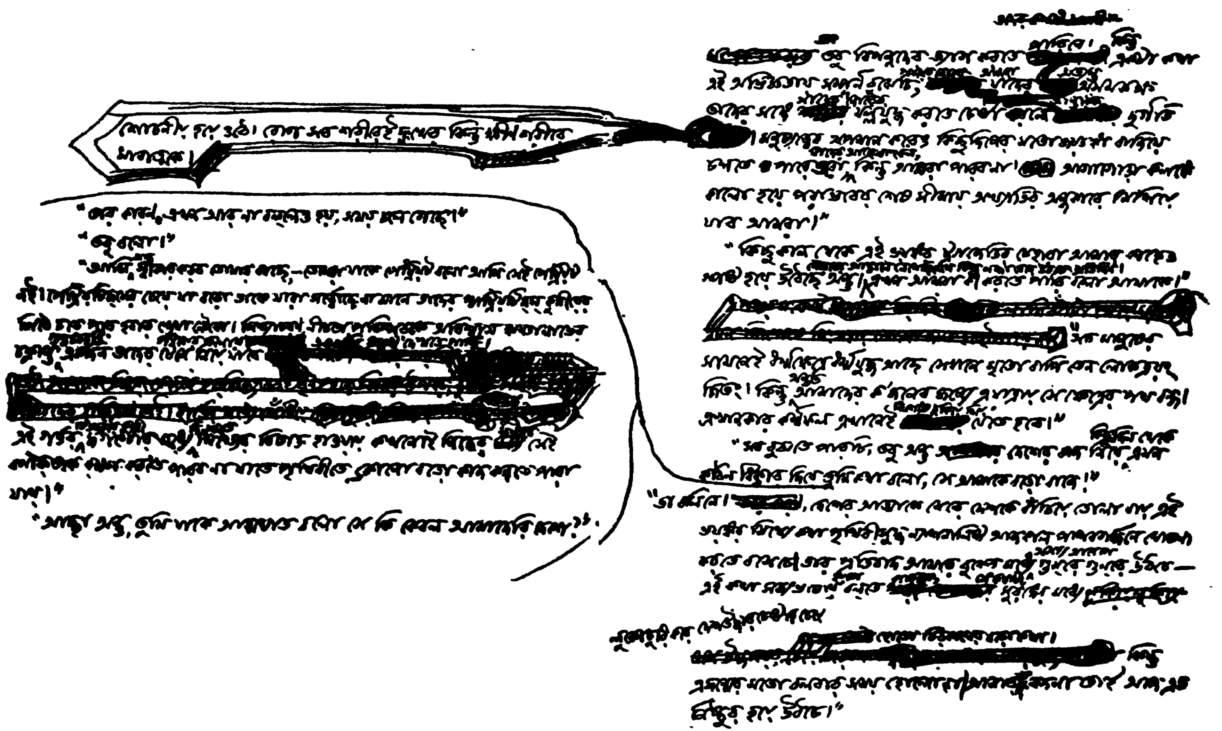

পাণ্ডুলিপিচিত্র : চার অধ্যায় -এর একটি পৃষ্ঠা

seen as a noble emotion, which raises up the spirit of man and inspires him, thereby enabling him in some way to enrich the human race as a whole."[১]

এ যেন প্রায় চার যুগের ওপার থেকে ভেসে-আসা অতীন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি। তথাকথিত পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌-এর চেয়ে যেটা বড়ো, যেটা প্রকৃত স্বদেশপ্রেম সে এক উদার মহান সংরাগ। জঙ্গী মাংসপেশীর আস্ফালন থেকে তার প্রকাশ একেবারে আলাদা জাতের। মানবপ্রেমের মধ্য দিয়েই তো তার চরিতার্থতা। মানব-আত্মাকে সুষমায় উজ্জ্বল করে সে। সুন্দরের উপাসক, তাই সে সার্থক সাহিত্যের বনিয়াদ গড়ে। "যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানো না মণি", আত্মক্রান্তির সেই ধনে মানবজাতিকে ধনী করে তুলবার শক্তি আছে তার। এই স্বদেশপ্রেমের লক্ষ্য হল: সব মানুষ নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে "এক-মানুষ"-এর উপলব্ধির আকৃতি। কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে যে-পেট্রিয়টিজ্‌মের উত্তপ্ত অগ্নি-সাধন চলেছে তার মধ্যে এই মানবিক আদর্শের প্রেরণা নেই। এই অভাবটাই অতীন্দ্রকে ব্যথিত করে: "দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশানালিস্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে— এই কথা সত্য ভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ উদ্ধার-চেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ জন্মের মতো বলবার সময় হল না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।" (পৃ. ৯৪-৯৫)

এমন একটি মানবিক আদর্শে যার মন অনুশীলিত, সে কেন বৈভীষিক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিল এ প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। অবশ্য প্রেমের প্রেরণা ছিল সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধু যে একমাত্র প্রেমের তাগিদেই সে আন্দোলনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, তা নয়। মুক্তি-সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে তার আদর্শ পূর্ণতা লাভ করবে এমন এক আশার আহ্বান তার প্রাণে জেগেছিল। দান্তে ও বিয়েত্রিচের জীবনে কি তাই ঘটে নি? প্রেম ও আদর্শের অপরূপ সমন্বয়ে

১. *The Politics of Solzhenitsyn*, Macmillan Press Ltd., 1977, p. 68

এক ঐতিহাসিক সার্থকতার সম্ভাবনা দেখেছিল তার রোমান্টিক মন। যেন ভাগ্যলক্ষ্মীই তাকে দিয়েছে "ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ" রচনা করবার গুরুদায়িত্ব। অতীন্দ্র চেয়েছিল, সত্য-বীর্য-গৌরবের পথ দিয়ে অন্যায়ের অবসান ঘটাবে, উপদ্রুত মানুষের আত্মশক্তিকে জাগিয়ে মানবধর্মের জয়বাণী ঘোষণা করবে। কিন্তু তার স্বপ্ন ভাঙল যখন সে দেখল কোনো নৈতিক শক্তি-পরীক্ষায় তারা নামে নি। তারা অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে রোধ করতে চেয়েছে, মিথ্যা দিয়ে কপটতা দিয়ে হিংসা দিয়ে মিথ্যা-কপটতা-হিংসার উচ্ছেদ সাধন করতে উদ্যত হয়েছে। সে দেখল, তার চারি দিকে "মুখোশপরা চুরি-ডাকাতি খুনোখুনির অন্ধকার।" যেখানে এমন করে আত্মশ্রদ্ধার অবলোপ, সেখানে সত্য-বীর্য-গৌরবের আলোকস্তম্ভ রচনা করা সম্ভব নয়। অতীন্দ্র স্পষ্ট অনুভব করে: "মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি" (পৃ. ৯৪)। ধর্মহীন কৌরব পক্ষের পরাজয় আসন্ন, এই সত্য মহাবীর কর্ণের দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন: "হেরিতেছি শান্তিময় / শূন্য পরিণাম।" অতীন্দ্রও উপলব্ধি করতে পেরেছিল, "আত্মার সর্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ সে দেখছে কোনো যথার্থ ফল নেই এতে, নিঃসংশয় পরাভব সামনে" (পৃ. ৭৭)। মুক্তি নেই এই সম্ভাবনার হাত থেকে: "সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে, সেখানে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং। কিন্তু অন্তত আমাদের ক-জনের জন্যে এ-যাত্রায় সে-ক্ষেত্রের পথ বন্ধ। এখানকার কর্মফল এখানেই নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে" (পৃ. ৯৩)। যে পরাভবের জন্য নিঃসংশয় প্রতীক্ষায় অতীন দিন গুনছে সে যদি শুধু বাহিরের পরাজয় হত, তা হলে হয়তো তার মূল্যায়ন সম্ভব ছিল। কিন্তু এ যে আত্মার পরাজয়। তার কোনো সার্থকতা নেই। "পরাভবেরও মূল্য আছে, কিন্তু আত্মার পরাভবের নয়, যে পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই; যার অন্ত নেই" (পৃ. ৭৭)। এই-যে আত্মার পরাজয়: এটাই অতীন্দ্রের দুঃসহ আত্মগ্লানির উৎস।

আমাদের এই যন্ত্রযুগকে বস্তুতান্ত্রিক বলে অভিহিত করা হয়। অভিধাটি সার্থক। 'বস্তু'-কে আমরা সহজেই বুঝতে পারি: গাড়ি গাড়ি আসবাবপত্র টাকাপয়সা: এক কথায় William James যাকে "bitch goddess success"

বলেছেন : তারই নিশানবাহক ঐ পদার্থগুলি। এরা বেশ মোটা-সোটা জিনিস। এগুলির জন্য যখন ছুটি তখন আমাদের মনেই হয় না আমরা কোনো ছায়ার পিছনে ছুটছি। এই বস্তুগুলির আকর্ষণে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের চিনতে কোনো কষ্টই হয় না। তাদের অন্বেষণটাও আমাদের কাছে 'বাস্তব' বলে মনে হয়। তাই সন্দীপ-মধুসূদন জাতীয় মানুষেরা আমাদের কাছে 'বাস্তব'। কিন্তু নিখিলেশ-অতীন্দ্র: তারা বিভ্রম জাগায়, কারণ তারা যে-জিনিসগুলির পিছনে ছোটে সেগুলি আমাদের জানাশোনা 'বস্তু' নয়, শুধু আইডিয়া মাত্র। আইডিয়া থেকে যে ট্র্যাজেডি আসে, সেটা আমাদের কাছে অবাস্তব ছায়ালীন ভাবপ্রবণতা বলে মনে হয়। তাই অতীন্দ্রের ট্র্যাজেডিকে আমরা অবাস্তব বলে মনে করি। অতীন্দ্র আদর্শবাদী। আদর্শ তার কাছে ব্যঞ্জনামাত্র নয়: কেবল একটি সুবিধাবাদী প্রায়োগিক উপায়মাত্র নয়। আদর্শ তার অন্তরের সত্য, অস্তিত্বের অর্থ। টাকার পিছনে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ যে-মানুষ একদিন শেয়ার-মার্কেটে মার খেয়ে গেল, তার হাহাকার যেমন বাস্তব, অতীন্দ্রের আদর্শ-ভ্রংশনের দুঃখ তার চেয়ে কিছুমাত্র কম 'বাস্তব' নয়। শেয়ার-মার্কেটে জীবনের সঞ্চয় ঢেলে দিয়ে দেউলে হবার দুঃখ আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু আদর্শের মধ্যে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে দেউলে হয়ে যাওয়ার সর্বহারা বেদনা আমাদের বস্তুবাদী বোধের কাছে কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয়।

অতীন্দ্রের সামনে একটি মাত্র মুক্তির পথ ছিল : দলত্যাগ। সেখানেও সেই স্বভাবের বাধা। অতীন্দ্রের হয়ে এলা যখন ইন্দ্রনাথের কাছে মুক্তি-প্রার্থনা জানায়, ইন্দ্রনাথ তখন তাকে বুঝিয়েছিল : "আমি নিষ্কৃতি দেবার কে। ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোনোকালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতি মুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত" (পৃ. ২৮)। কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এলা যখন তাকে জীবনের পথে ফিরে আসবার জন্য আকুল অনুরোধ জানায়, তখন অতীন্দ্র তার নিরুপায় অক্ষমতা প্রকাশ করে বলে : "তীর লক্ষ্য হারাতে পারে, তূণে ফিরতে পারে না" (পৃ. ৯৫)। দুঃখের সঙ্গে সে স্বীকার করে : "পথ আমার নয়, আমিই পথের। গলার ফাঁসকে গলার গয়না কেউ বলে না।" (পৃ. ৯৭)

যে-কারণে অতীন্দ্র দল ছাড়তে পারল না, সেটা তার চরিত্রের এক দৃপ্ত

বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত। অতীন্দ্র যখন দলকে আপন চিন্তাধারা আপন আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত করতে পারল না, তখন কেন সে দল ছেড়ে চলে গেল না? এর উত্তর এলা জানতে চায়। অতীন্দ্র উত্তর দেয়: "আর কি ছাড়তে পারি? তখন যে শাস্তির নিষ্ঠুর জাল সম্পূর্ণ জড়িয়ে এসেছে ওদের চার দিকে। ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্মান্তিক বেদনা, সেইজন্যেই রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারি নে" (পৃ. ৯২-৯৩)। এই সহচর-আনুগত্য তার এক মহানুভব একনিষ্ঠার নিদর্শন। সে সমালোচনা করবে তিরস্কার করবে ঘৃণা করবে তাদের "শোচনীয় আন্তরিক দুর্গতি"-কে, কিন্তু তবু তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারবে না। তারা বিপন্ন, তারা হারছে মরছে। হারছে মরছে বলেই তাদের উপর অতীন্দ্রের গভীর সহানুভূতি। মহাবীর কর্ণের কথাই মনে পড়ে। তিনি কুন্তীকে বলেছিলেন, "যে পক্ষের পরাজয় / সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।" হেরে-যাওয়া পক্ষকে পরিত্যাগ করা এক সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। বীরের স্বভাবে তার স্থান নেই। এমনি করে তিলে তিলে তার স্বভাবকে হত্যা করে অতীন্দ্র তার স্বভাবকে রক্ষা করবার প্রাণান্তকর সাধনায় মগ্ন হয়ে রইল।

জীবনের শেষ প্রান্তে যেখানে সে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে মৃত্যুই একমাত্র মুক্তির পথ। মৃত্যুর মধ্যে আছে অসীম ক্ষমা, অনন্ত মুক্তি। কিন্তু তাই বলে অতীন্দ্র মৃত্যুকে পালাবার পথ বলে মনে করে নি। সে বন্দী হয়ে আছে জীবনের ছোট্ট একটি আগল-দেওয়া আলোবাতাসহীন কক্ষে। সেখানে আছে শুধু অন্ধকার বিকৃতির ভ্রূকুটি, আছে খণ্ডতা-অসম্পূর্ণতার ত্রুটি। অতীন্দ্রের রুদ্ধশ্বাস প্রাণ স্বপ্নে দেখে অনন্ত প্রসারের যেখানে সে ডানা-মেলে-দেওয়া আনন্দের সন্ধান পাবে। তার বর্তমান জীবনে মৃত্যুই সেই অনন্তের নিশানা। এলার মৃত্যুদূত অতীন্দ্র এলাকে বোঝায় মৃত্যুতত্ত্ব: "জীবনটা জালিয়াত, সে অনন্তকালের হস্তাক্ষর জাল করে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ করে দেয়। সে হাসি নিষ্ঠুর হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত সুন্দর হাসি, মোহরাত্রির অবসানে" (পৃ. ১০১-১০২)। পলে-পলে-অনুভূত অনিশ্চয়তার দিশাহারা বেদনার মধ্যে অতীন্দ্র খুঁজে মরে নিশ্চয়তার শান্তি। মৃত্যু ছাড়া সেই নিশ্চয়তা কোথায়! "মৃত্যু সব চেয়ে নিশ্চিত— জীবনের সব গতিস্রোতের চরম

সমুদ্র, সব সত্য-মিথ্যা-ভালোমন্দর নিঃশেষ সমন্বয় তার মধ্যে" (পৃ. ১০২)। ব্যর্থ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুর সীমাহীন সার্থকতা অতীন্দ্রকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। যে-মৃত্যুতত্ত্ব এলার কাছে ব্যাখ্যাত হয়, তার লক্ষ্য শুধু এলার মৃত্যুপ্রস্তুতি নয়। প্রকৃতপক্ষে সে অতীন্দ্রের অন্তরতম প্রার্থনার বাণী।

অতীন্দ্রের উপর এলা-হত্যার ভার পড়ল কেন, এ প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। এটা কি শুধু কাহিনীর নাটকীয় পরিসমাপ্তির জন্য? বস্তুত কাহিনীর জন্য যতটা না-হোক, অতীন্দ্র-চরিত্রের পরিপূর্ণতার জন্য ঘটনাটির প্রয়োজন ছিল। অতীন্দ্রের কাহিনী বেদনাময় আত্মবিনাশের ইতিকথা। সর্বনাশের যে ধাপে সে এসে পৌচেছে, যেখানে চুরি-ডাকাতির টাকা দিয়ে তাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হচ্ছে। একদা-রুচিমান শৌখিন বিদগ্ধ যুবকটির কাছে এর চেয়ে আর কী বেশি গ্লানিকর লজ্জাকর অবস্থা হতে পারে? কিন্তু এখনো শেষ ধাপটি বাকি: হত্যা। লক্ষ্যলাভের প্রয়োজনে সংঘটিত হত্যাকে সন্ত্রাসবাদ গর্হিত মনে করে না; কিন্তু মানবধর্মীর কাছে হত্যা অমার্জনীয় পাপ। সেই পাপ যেদিন অতীন্দ্রের হাত দিয়ে অনুষ্ঠিত হল, সেদিন যবনিকা পড়ল তার চরিত্রের উপর। হুইস্‌লের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাই অতীন্দ্রের কাহিনীও শেষ হল। অতীন শুধু এলাকেই হত্যা করল না; আপন আত্মার 'পরেও চরম আঘাত হানল। দলের প্রতি আনুগত্যের শেষ প্রমাণ দিল দলবিদ্বেষী অতীন্দ্রনাথ তার জীবনের অন্তরতম প্রেয় এবং শ্রেয়কে হত্যা ক'রে। আত্মহননের এক বিস্ময়কর ছবি: গভীর বেদনায় রক্তিম।

কর্তব্যপরায়ণতা অতীন্দ্র-চরিত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যত কঠিন হোক, যত রূঢ় যত অপ্রিয় হোক-না কেন, কর্তব্যের আহ্বান তার কাছে অমোঘ। "কর্মের যে শাসন স্বীকার করে নিয়েছে তাকে অসম্মান করাকে অতীন আত্মসম্মানের বিরুদ্ধ বলেই জানে" (পৃ. ৬৯)। সুতরাং আদেশ-পালনে ব্যতিক্রম ঘটে নি কখনো। যখনই ডাক পড়েছে, সে সাড়া দিয়েছে দৃঢ়চিত্তে— এলার অনুনয়-বিনয়ও তাকে আটকে রাখতে পারে নি। এই নিয়ে এলা অনুযোগ করেছে, তুমি ধন্য অন্তু! যেমনি আমার বাড়িতে আসা নিষেধ হল অমনি সেটা তো মেনে নিতে পারলে" (পৃ. ৭৮)! অতীন্দ্র তার উত্তরে বলে: "ওটা আমার স্বাভাবিক স্পর্ধা। প্রচণ্ড ইচ্ছে আমাকে অজগর সাপের মতো দিনরাত প্যাক দিয়ে দিয়ে

পিষেছিল তবু তাকে মানতে পারলুম না। ওরা আমাকে বলে সেন্টিমেণ্টাল, মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল সংকটের সময় প্রমাণ হবে আমি ভিজে মাটিতেই তৈরি। ওরা ভাবতেই পারে না সেন্টিমেণ্টেই আমার অমোঘশক্তি।"

"সেন্টিমেণ্ট" এবং "সেন্টিমেণ্টাল": রবীন্দ্রনাথ অত্যল্প পরিসরে এই দুটি শব্দ যে-ভাবার্থে প্রয়োগ করেছেন, তা বিস্ময়কর। স্বভাবে মানুষ দুই শ্রেণীর : "এক-বুনোনি"-র মানুষ এবং "দু'-বুনোনি"র মানুষ। প্রথমটি সংকল্প-নিষ্ঠ। তারা সংকল্প থেকে একটুকু এধার-ওধার করে না। সংকল্প-সাধনই তাদের আত্মসম্মানের মাপকাঠি। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়াসে তারা সাধন-পথের শেষ পর্যন্ত যাবে; যদি অন্তে থাকে অন্ধকার গহ্বর, তবুও। তারা একব্রত। কিন্তু যাদের স্বভাবে থাকে "দুরকম বুনোনির কাজ", তাদের মানসমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত : তারা দ্বিরুক্তিপ্রবণ, "আমি তো তা বলি নি" বা "আমি তো ওই অর্থে বলি নি"; নিজেরা দ্বিরুক্তিপ্রবণ বলেই বোধ হয় (সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে) অন্যকেও দ্বিরুক্তিপ্রবণ বলে ধরে নেয় এবং উক্তির অর্থ-নির্ধারণে "উল্টা বুঝলি রাম"— নীতি অনুসরণ করে। তারা কথায়-কাজেও অসমঞ্জস, যেমন বক্তৃতায় "high thinking and plain living"-এর গুণগান কিন্তু জীবনযাপনের বেলায় উল্টোটাই অনুসৃত। কৌতূহলের কথা, দুরকমের এই জীবনযাপন প্রণালীর মধ্যে যে বৈষম্য আছে তারা বিশ্বাস করে না, স্বীকার করার কথা তো দূরের ব্যাপার। সমাজে এই দ্বিখণ্ডিত ব্যক্তি-মানসের উদাহরণ মিলবে অনেক। তাই এলা যখন ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করে, "লোক চিনতে আপনি কি কখনো ভুল করেন না।" ইন্দ্রনাথের সহজ বাস্তব উত্তর, "করি। অনেক মানুষ আছে যাদের স্বভাবে দুরকম বুনোনির কাজ। দুটোর মধ্যে মিল নেই। অথচ দুটোই সত্য। তারা নিজেকেও নিজে ভুল করে" (পৃ. ২৯)। কবির এই প্রয়োগশৈলী আরো বিস্ময়কর বলে মনে হয় যখন দেখা যায় দুটি শব্দের অর্থ-নিরূপণ আজও বাষ্পাচ্ছন্ন। এমন-কি, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর কৌতূহলী দৃষ্টির, বলা যায়, প্রায়-বাহিরেই পড়ে আছে। অথচ সাম্প্রতিককালে যা ঘটেছে ঘটছে (এবং ঘটবেও আরো নিদারুণরূপে) তাদের পিছনে সেন্টিমেণ্টের অনস্বীকার্য প্রেরণা : নানা-রকমের সেন্টিমেণ্ট, যেমন, ব্যক্তি-স্বাধীনতার সেন্টিমেণ্ট, স্বদেশপ্রেমের সেন্টিমেণ্ট, সাদা-কালোর বিভেদসূচক সেন্টিমেণ্ট, এমনি আরো কত সেন্টিমেণ্ট। এগুলো ভালো কি খারাপ, সৎ

কি অসৎ, মানবিক কি অমানবিক— সেই মূল্যায়নের প্রশ্ন নাই বা উঠল ; কিন্তু এ কথা কি অগ্রাহ্য করা যায় যে অধুনাতন ঘটনাগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন ? তাই C. J. Addock-এর সঙ্গে আমাদেরও বলতে হয় : "...modern psychologists have perhaps been remiss in not devoting more attention to the area."[১]

'সেন্টিমেণ্ট' শব্দটি ভদ্র, কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু কৌতুকের কথা এই যে, তার বিশেষণ পদ 'সেন্টিমেণ্টাল'-এর প্রয়োগে তাচ্ছিল্যের সুর বাজে। মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞায় সেন্টিমেণ্ট বলতে সংরাগপুঞ্জকে বোঝায়। কোনো এক বা একাধিক বস্তু বিষয় বা ব্যক্তিকে ঘিরে একাধিক সংরাগ জমাট বাঁধে। Yan D. Suttie-র ভাষায় : "...According to academic Psychology a sentiment...does not consist of one kind of emotion only, but employs a number of different emotions all in relation to the same thing, person or purpose."[২] এইভাবে একাধিক সংরাগ যখন নির্দিষ্ট বস্তু বিষয় বা ব্যক্তিকে ঘিরে পঞ্জীভূত হয় তখনই সেন্টিমেণ্টের জন্ম।

চরিত্র-গঠনে সেন্টিমেণ্টের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেন্টিমেণ্ট-সৃজনের ধারাপ্রণালী শৈশব থেকে শুরু হয়। সামাজিক পরিপেক্ষিতে তার ক্রম-বিবর্তন। কে বন্ধু কে শত্রু, কে শ্রদ্ধেয় কে স্নেহভাজন, কোন্‌টা সুকৃতি কোন্‌টা কুকৃতি, কোন্‌টা শ্রেয় কোন্‌টা অশ্রেয় : এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরগুলো সেন্টিমেণ্ট-সৃজনের রসদ-জোগানদার ; তারা অভিজ্ঞতার বর্ণালীতে রঙিন হয়ে বেড়ে ওঠে, নির্দিষ্ট প্রবণতা গড়ে ওঠে, মনকে রসিয়ে তোলে মানমূল্যায়নের সুধারসে। তাই সেন্টিমেণ্টের এত শক্তি— একাধিক সংরাগের সুধারসে সিঞ্চিত সঞ্চিত আবেগ-শক্তি। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক : প্রেম। একজন ব্যক্তিকে ঘিরে পুঞ্জীভূত হয় একাধিক সংরাগ ; যেমন, সুখ দুঃখ ভয় স্নেহ শ্রদ্ধা সমবেদনা ইত্যাদি। প্রেমাস্পদের আসঙ্গে সুখ, অনুপস্থিতিতে দুঃখ, তার ঔদার্যে শ্রদ্ধা, তার নিঃসঙ্গ অসহায়তায় স্নেহ, সেবায় আনন্দ, রোগে আশঙ্কা, সাফল্যে উল্লাস, বিফলতায়

১. *Fundamentals of Psychology*, Penguin Books, 1964, p. 103

২. *Origins of Love and Hate*, Penguin Books, 1960, p. 48

সমবেদনা। সেন্টিমেণ্ট হিসাবে প্রেম অতি শক্তিশালী। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আলোচ্য উপন্যাসটি। এমন দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে ইতিহাসে সাহিত্যে।

অতীন্দ্র বলেছে, সেন্টিমেণ্টেই তার অমোঘ শক্তি। সেই সেন্টিমেণ্ট কী হতে পারে? এক কথায় বলা যেতে পারে: তার কৌলীন্যবোধ। কী প্রেমে কী কর্তব্য পালনে, কৌলীন্যবোধের শাসন সর্বত্র। শুধু কামনার কৌলীন্য নয়, সামগ্রিক সংরাগপুঞ্জের কৌলীন্য রক্ষার প্রবণতা তার এক বিশেষ বৈলক্ষণ্য। এই প্রবণতার ফল: আত্মবিরোধী সংরাগগুলির কোলাহল। সুখ দুঃখ আশা নিরাশা সমবেদনা ঘৃণা রুচি অরুচি আসক্তি নিরাসক্তি ইত্যাদি অনেক সংরাগ জটলা করে তার প্রিয়া-প্রেম এবং স্বদেশ-প্রেমকে কেন্দ্র ক'রে। অনুভূত আত্ম-বিরোধের ফলে অতীন্দ্র-চরিত্রে দ্বিধা-বিভাগ দেখা যায়। অতীন্দ্র যেন দুজন মানুষ। তাই যদি হয়, তা হলে তার কোন্ পরিচয় সত্য, কোন্টা বাস্তব? একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অতীন্দ্রের সত্য পরিচয় কোনোদিন বাস্তব হয়ে উঠল না; আর তার বাস্তব পরিচয় সত্যের মর্যাদা পেল না। কিন্তু এই মরুবিভাগ অতীন্দ্রের মতো সূক্ষ্মধী স্পর্শকম্পিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে না; কারণ তাই যদি ঘটত তা হলে তার চরিত্রে আত্মপ্রবঞ্চনা দেখা দিত, সে অব্যবস্থিত-চিত্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু দেখা যায়, তার মানসমণ্ডলে যতই ঝড় উঠুক-না কেন, তার ব্যক্তিত্বে একটানা ঐক্যের কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। এর একটিই কারণ হতে পারে: কৌলীন্যবোধ— বাস্তব এবং সত্যের মধ্যে কৌলীন্যবোধই এক প্রহেলিকাময় ভাবমূর্ত সেতু।

'কৌলীন্যবোধ' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহারিক অর্থে প্রয়োগ করেন নি, করেছেন আত্মিক অর্থে যার তাৎপর্য হল চরিত্রের উৎকর্ষ। যে মানুষটি স্বভাব-হনন ও স্বধর্ম-ভ্রংশনের গ্লানিতে জ্বলে-পুড়ে মরছে তার চরিত্র তো কবেই সে হারিয়ে ফেলেছে; তা হলে কৌলীন্যবোধ কি ক'রে এখনো বেঁচে আছে? উত্তরে বলা যায়, একটি সেন্টিমেণ্ট শেষ অবধি তার কৌলীন্যবোধকে রক্ষা করে এসেছে। সেটা হল সংকল্প-নিষ্ঠা যা কৌলীন্যবোধের প্রাণকেন্দ্র।

সংকল্প: এই ধীকল্পটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এটা যুগপৎ চিন্তন এবং সংরাগের সম্মিলিত সৃষ্টি। চিন্তন মৃন্ময় মূর্তি গড়ে, সংরাগ তাকে চিন্ময় ক'রে তোলে। সংকল্পের দুটি রূপ। একরূপে সে একার্থক, আর-একরূপে

দ্ব্যর্থক। একার্থক রূপে সংকল্প যখন প্রযুক্ত, তখন সংকল্পের বিষয় সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা কল্পিত হয় যার অর্থ একটাই: অনন্যমন সংকল্প-আসঞ্জনের দৃঢ় সন্নিবিষ্টতা, সেই অন্তঃশীল আসঞ্জনের মধ্যে এতটুকু ফাঁক-ফাঁকির ছিদ্র নেই, নেই এতটুকু হৃদয়দৌর্বল্যের সংশয়। দ্ব্যর্থক রূপে কিন্তু সংকল্পের চিত্রে রঙের আলতো ছোঁয়া, আবছায়া আভাস, ধোঁয়াটে তাৎপর্য। তাই প্রয়োজন অনুসারে তার অর্থের হেরফের করা সম্ভব। কর্ণের সংকল্প ছিল তাঁর আরাধনাকালে যদি কোনো প্রার্থী উপস্থিত হন এবং কিছু যাচনা ('কিছু' বলতে 'যে-কোনো' বা 'যা-কিছু' অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে) করেন তবে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। একদিন একজন প্রার্থী এলেন এই যাচনা নিয়ে যে কর্ণপুত্র বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণ করবার সাধ জেগেছে তার। সেইসঙ্গে জুড়ে দিলেন, বৃষকেতুকে বধ করবেন কর্ণ নিজের হাতে এবং বধ করবার কালে যেন কর্ণের চোখে জল না আসে। দৃঢ় চিত্তে কর্ণ সংকল্পপালনে ব্রতী হলেন। এটা একার্থক সংকল্প। আবার, দেখা যায় অন্য এক চিত্র যেখানে দশরথ কৈকেয়ীর দুটি ইচ্ছা পূর্ণ করবার সংকল্প করেছিলেন। যখন সময় এল, তখন দশরথ দোদুল্যমান কেননা তিনি ভাবেন নি সেই ইচ্ছার বিষয় হবে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়জন। এই দশরথেরই আর-একটা মূর্তি যখন তিনি প্রজার কল্যাণের জন্য সূর্যতনয় দুঃখের দেবতা শনির সঙ্গে যুদ্ধ করতে ছুটেছিলেন, পরাজয়-মরণ নিশ্চিত জেনেও। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দশরথের সংকল্প একার্থক। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে তাঁর সংকল্প দ্ব্যর্থক, কেননা তিনি অন্যমনা; পুত্রস্নেহ এবং সংকল্প-পালনের মধ্যে দ্বন্দ্ব জেগেছে। এই উদাহরণে সংকল্পের বিষয় এক: পুত্রস্নেহ এবং পুত্রপ্রতিম প্রজা। কিন্তু বিষয়ের অর্থ-তাৎপর্য নিয়ে সংশয়ের দোলা। দ্ব্যর্থক রূপ শুধু নামেই সংকল্প। প্রকৃতপক্ষে সংকল্প সার্থকনামা হয় শুধু একার্থক রূপেই। সেখানে সে সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিশ্রুত, আত্মসমর্পিত। সার্থকনামা সংকল্পের দাবি একটাই: সকল-সহা সকল-বহা নিঃসংশয় নিঃসংকোচ অন্তর্বাধ্য অবিহ্বল আত্মজয়ের কঠিন-কঠোর পণ। সেটাই তো সংকল্প-পালনের ক্ষুরধার পথ। সেটাই তো আত্মক্রান্তির পথ।

অর্থের স্বচ্ছতা, তার পরিধি, সক্ষমতা: এগুলি সংকল্প-গ্রহণের পূর্বে নির্ধারণ করা কর্তব্য। অতীন্দ্রের সহিংস আন্দোলনে যোগদানের সংকল্প গ্রহণ করবার পূর্বে সেই আন্দোলন সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল না। তা হলে

তার সংকল্প কি ব্যর্থক পর্যায়ে পড়বে? পড়বে না, কেননা তার সংকল্পের বিষয় ছিল স্বার্থবিবর্জিত গোষ্ঠী-নির্দিষ্ট কর্মানুষ্ঠান। সেই কর্ম যদি রুচিহন্তাও হয়, নিষ্ঠায় কোনোরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যাবে না। সেটাই সংকল্পবন্ধন, স্বেচ্ছায় স্বীকৃত গৃহীত বন্ধন।

সংকল্পেও তিনটি ধারণার প্রকাশপথ; যেমন, দায়িত্ব, আত্মপরিচিতি এবং নিষ্ঠা। সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিবিশেষের সামনে একাধিক সম্ভাব্য সংকল্পের ভাবমূর্তি উপস্থাপিত হয়। তাকে যে-কোনো একটিকে বেছে নিতে হয়। এই বেছে-নেওয়ার কাজে তার স্বাধীনতা আছে। নির্বাচনের ভার আমারই উপর ন্যস্ত। ফলাফলের জন্য আমি দায়ী। যদি মনোমতো না হয়, সেই বিফলতার জন্যও সব দায়িত্ব আমার। অপরের পরামর্শ বা উপদেশানুযায়ী চলে বিফল হয়ে অপরকে দায়ী করা, অস্তিবাদীর মতে, দুঃশীল কর্ম বলে পরিগণিত; কেননা স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া পরামর্শের ফলের জন্যে নিজেকেই দায়ী হতে হয়। সংকল্প এবং দায়িত্ব এক-জোড়া শব্দ; একটিকে বাদ দিলে অন্যটি অর্থহীন হয়ে পড়ে; যেমন, জনক-জননী, ভ্রাতা-ভগ্নী ইত্যাদি। সংকল্পের দাবি: সর্বান্তঃকরণ স্বীকার, আত্মসঞ্জাত কর্মপ্রবণতা। যদি কোথাও কোনো "কিন্তু" জাগে, দেখা দেয়, তা হলে সংকল্প বিকল্প হয়ে পড়ে। Jean-Paul Sartre-র ভাষায়: "Whereas the existentialist says that the coward makes himself cowardly, the hero makes himself heroic; and there is always a possibility for the coward to give up cowardice and for the hero to stop being a hero. What counts is the total commitment, and it is not by a particular case or particular action that you are committed altogether."[১] সম্ভাবনাপূর্ণ মানবজীবন। যে আজকে ভীরু, তার মধ্যেও উপ্ত আছে সাহসিকতার বীজ। কালকে প্রমাণ করতে পারে সে নির্বিশঙ্ক। শর্ত একটাই: সর্বান্তঃকরণ গ্রহণ এবং নিঃশর্ত পালন। প্রকৃতিতে সংকল্প একাধারে বন্ধন এবং

---

১. *Existentialism and Humanism*: Translation and Introduction, Philip Mairet, Methuen & Co. Ltd. 1968, p. 48

মুক্তি। সংকল্পই বন্ধন, আবার সেই বন্ধনই মুক্তিধর্মী, জৈবিক দিক থেকে জীবন-বন্ধন, আত্মিক দিক থেকে সত্তার উন্মুক্ত অসীমতা।

মানুষ সীমাবদ্ধ জীব: সীমাবদ্ধতার কারণে তার অস্তিত্বের মাঝে অনেক ত্রুটি অনেক দৈন্য দেখা যায়। এবং এটাও জানা যে, এই ত্রুটি ও দৈন্যকে অতিক্রম করবার শক্তিও তার আছে। সেই শক্তিকে জাগাতে হলে কঠিন সাধনার প্রয়োজন এবং সাধনার পথ একটিই: আত্মক্রান্তি-জৈবিক অস্তিত্বকে আত্মিক সত্তায় উন্নীত করা। ইন্দ্রনাথ একেই বলেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণত্বকে জাগিয়ে তোলা। কিন্তু বাস্তব জীবনে সাধারণ মানুষ (কী জ্ঞাতসারে কী অজ্ঞাতসারে) সাধারণ হয়েই থাকতে চায়; শুধু দিনযাপনের গ্লানিতে কোনো অস্বস্তিবোধ করে না, ভাবে, 'কেন আবার ঝুটমুট ঝামেলায় জড়ানো— এই তো বেশ আছি।' এই মানুষের কাছে যদি বড়ো কিছু-একটা দাবি করা হয় যেখানে তার অন্তরতম সত্তার জাগরণের আহ্বান পৌঁছয় তখন সেই ব্যক্তিমানস দশরথের মতোই দোদুল্যমান: কঠোর সংকল্পের বাঁধনে নিজেকে বাঁধবে কি না। এই ব্যক্তিমানসের বিশ্লেষণে Karl Jaspers বলেছেন: "The resentment of the transforming new thought really goes back to man's unwillingness to be himself. It is our defense against claims upon our true selves, and an outgrowth of our secretiveness. We do not like to show ourselves to lay ourselves bare, to commit our true selves."[১]

সংকল্পের বাঁধনে মানুষ সাধারণত ধরা দিতে চায় না কারণ সংকল্পের সঙ্গে সাধনা একাত্মক। নিজের আত্মিক পরিচয় (যেটা অবশ্যই জৈবিক পরিচয় থেকে ভিন্ন) মানুষকে নিজেই সৃষ্টি করতে হয়। সেই সৃষ্টির জন্য চাই অনন্যমনা নিষ্ঠা। সাধনার একমাত্র সহায়: নিষ্ঠা। মানুষের কাছে কবির আহ্বান-বাণী:

"আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি
ম্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি—

১. *The Future of Mankind*, The University of Chicago Press, Phoenix Edition, 1963, p. 206

লুপ্ত হয়ে যাক শূন্যতলে
দ্যুলোকের ভূলোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে ॥"

—জন্মদিনে, ২৫

কবি যে-মন্ত্রণার কথা বলেছেন, সেই মন্ত্রণা একমাত্র নিষ্ঠার মন্ত্রণা: একনিষ্ঠ প্রয়াসের মন্ত্রণা। তুচ্ছতায় জর্জরিত আত্মার অবসন্ন মহিমাকে উদ্ধার— এই সংকল্প-রূপায়ণের পথে "শত শত কৃত্রিম বক্রতা" জীবনের ছন্দকে তাল-ভাঙা করে; মিলন ভ্রষ্ট হয়; "বাঁচিবার উৎসাহ ধূলিতলে লুটায় শিথিল।" শিথিল উৎসাহের ঘনায়মান অন্ধকারে জীবনবিকাশের, সত্তালাভের আভা কোথা হতে উৎসারিত হবে? উৎস হল একটাই: নিষ্ঠা, কবির ভাষায়, "নৈরাশ্যজয়ী নিষ্ঠা, আঘাতসহিষ্ণু নিষ্ঠা, বাহিরের-উৎসাহ-নিরপেক্ষ নিষ্ঠা, নিন্দায়-অবিচলিত নিষ্ঠা— কোনোমতে কোনো কারণেই সেই নিষ্ঠা যেন ত্যাগ না করে। সে যেন কম্পাসের দিকে চেয়েই থাকে, সে যেন হাল আঁকড়ে বসেই থাকে।"[১] এই নিষ্ঠার এক অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন কবি:

"এই শুধু জানিয়াছে সার—
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী;
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।"

...

"ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান—
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার

১. "নিষ্ঠার কাজ", শান্তিনিকেতন ১, পৃ. ১৫৬-৫৭

নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।”

—বলাকা, ৩৭

লক্ষ্য এক, ধ্রুব : নূতন সৃষ্টির উপকূল। আত্মসৃজন মানুষের ধর্ম। সৃজন-সাধনা সমাপ্ত হয় সত্তার প্রকাশে। অস্তিত্ব তখন নিজেকে পেরিয়ে, লাভ করে সার্থকতার অমৃত, অস্তিবাদে যাকে বলা হয় will to meaning।[১] দুঃসাহসী যাত্রী বজ্রবাণ হাসিমুখে বুক পেতে নেবে। নিন্দাবাণী যাত্রীকে দিগ্‌ভ্রান্ত করে, তাই সেটা শ্রবণে নেয় না। সাধুত্বের অভিমান অহংকারের মুখোশ, তাই বর্জনীয়। প্রয়োজন শুধু একটি মাত্র : অনন্যমনা নিষ্ঠা যে প্রলয়-পারাবারের মধ্যে কম্পাসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

অস্তিবাদের philosophy of 'commitment' এবং রবীন্দ্রনাথের 'সংকল্প-নিষ্ঠা' সমগোত্রীয়। অস্তিত্বের যাথার্থ্য (essence and existence), অপূর্ণতার বেদনাবোধ (anguish), অবিচলিত আত্মসৃজন-আত্মক্রান্তি (self-transcendence) : সব মানবিক জীবনবাদের একই লক্ষ্য : মানুষের দিকে মানুষের টান। কিন্তু পথ ভিন্ন, উপায়ও বিভিন্ন। এটাই বোধ হয় মানব-সংস্কৃতির প্রহেলিকাময় বৈচিত্র্যের মাঝে ঐকতান।

অতীন্দ্রের জীবনে সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। তার সামনে ছিল সংকল্পের একাধিক বিকল্প : প্রেম সাহিত্যসেবা স্বাধীনতা-সংগ্রাম ইত্যাদি। প্রেম তার এষণা-প্রেরণার উৎস। তার জীবনে প্রেমের প্রভাব ছিল গভীর। তার জীবনকে আত্মিক ধনে ঐশ্বর্যবান করে তুলতে পারত প্রেম। তার মধ্যে যে স্রষ্টা ছিল, প্রেমের প্রাণস্পর্শে সে জেগে উঠত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, প্রেম তাকে এমন জায়গায় পৌঁছে দিল যেখানে মায়াবী সংকল্পের জটিল জাল, যেখানে নীরন্ধ্র অন্ধকার, যেখানে আত্মিক পতনের অতল গহ্বর।

বিকৃতির আত্মগ্লানি, পরাজয়ের লজ্জা, স্বভাবহননের অনুতাপ, ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত বেদনা : অতীন্দ্রের জীবনের এই আকাশ-অন্ধ-করা কালো পটভূমিকায়

---

১. Victor E. Frankl, *Psychotherapy and Existentialism,* Penguin Books, 1978, pp. 17-24

তার ভালোবাসা এক বিচিত্র-মধুর অমা-ছেঁড়া আলোর মায়া জাগায়। এলা-অন্তুর জীবনে, অতীন্দ্র ঠিকই বলেছে, "ভোলবার যোগ্য ভারী ভারী দিনই তো বহু বিস্তর" (পৃ. ১০৭)। যে-দিনগুলো স্মরণীয়, তারা সংখ্যায় অতি অল্প। কিন্তু তারাই তাদের জীবনকে ভরে রেখেছে নিরভিযোগ স্নিগ্ধ-সুন্দর ভালোবাসার সুষমায়। এই দু-একটি দিনের কথা তাদের কাছে অমূল্য কারণ বিরাট না-পাওয়ার মাঝে এই দিন-কটিই নিবিড় পাওয়ার অমলিন স্মৃতি। সেই পাওয়া ক্ষণিক। কিন্তু অতীন্দ্র তাকে হৃদয়ের রসে রাঙিয়ে এক অন্তহীন অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। তাই অতীন্দ্র কেবলি ফিরে যায় তাদের প্রথম দেখার দিনটিতে যেদিন তারা এক-চমকের চিরপরিচয়ের বিস্ময়ে অভিভূত : ফিরে যায় তার এক জন্মদিনে যেদিন এলার কাছ থেকে পেয়েছে তার প্রথম চুম্বন, তার আদরের ডাক "অন্তু"। বাস্তবের শূন্যতার মাঝে অতীন্দ্র রচনা করে এক মধুর "মরীচিকার বাসর ঘর" যেখানে অক্ষয় হয়ে থাকে তাদের ভাবের মিলন। তার মনের গহনে কোথায় যেন একটা সান্ত্বনার সুর বাজে :

"যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাই নি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়॥"

—"দায়মোচন", মহুয়া

চিরবিচ্ছেদের শূন্যতা। তারই উপর অতীন্দ্র ছোট্ট কয়েকটি পাওয়ার রঙ বুলিয়ে অবিরাম এক সমগ্রতার অখণ্ড ছবি এঁকেছে। প্রেমের ধর্ম : সৃষ্টি করা, অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার আভাস জাগানো। দুরপনেয় বিরহের বুকে মিলনের বাসর ঘর রচনা করা— এই তো বাহিরে-ব্যর্থ অতীন্দ্রনাথের অন্তরে-সার্থক সৃষ্টি।

ইন্দ্রনাথ

'চার অধ্যায়' রচনার প্রায় তিন যুগ আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "পরম সত্যকে আমি কোনো নামের দোহাই দিয়া খণ্ডিত করিতে চাই নাই, ইহাতে আমার ধর্মনীতিকে নিজ্‌ঝে ও ট্রীট্‌স্কের ইংরেজ ও এদেশী শিষ্যগণ দুর্বলের ধর্মনীতি ও মুমূর্ষুর সান্ত্বনা বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন।"[১] এই অবজ্ঞার উত্তরেই হয়তো উত্তরকালে কবি শক্তিতত্ত্বের একটি বলিষ্ঠ প্রতিনিধি সৃষ্টি করলেন। ইন্দ্রনাথ সেই প্রতিনিধি।

শক্তিতত্ত্বের নানা ভাষ্য। রবীন্দ্রনাথ দুজন ভাষ্যকারের নাম করেছেন: নীট্‌শে ও ট্রীট্‌স্কে। এই দুজনের মতবাদে দুস্তর প্রভেদ। ট্রীট্‌স্কেবাদের ভিত্তি হল মাংসপেশীর শক্তি— বলং বলং বাহুবলম্‌। কিন্তু নীটশের তত্ত্ব ভাবময়, তার ভিত্তি হল আত্মশক্তি। তাই নীট্‌শের আসন দার্শনিক শ্রেণীতে। নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তকদের মধ্যে অগ্রণী বলে তিনি এখন স্বীকৃত। তবে নীট্‌শের এই সৌভাগ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ঘটনা। পূর্বে এই বিশ্বাসই প্রচলিত ছিল যে, নীট্‌শে একজন চণ্ডনীতির পৃষ্ঠপোষক, নাৎসীবাদের জনক। তার পরে আবিষ্কৃত তথ্যভিত্তিক নবমূল্যায়নে এই কথা স্বীকার করা হয়েছে যে, নীট্‌শে নাৎসীবাদের জনক তো ননই, বরং উগ্র পরিপন্থী ছিলেন। তবে এ কথাও অগ্রাহ্য করা যায় না যে, নীট্‌শেবাদ দার্শনিক মহলে এখনো বিতর্কের বিষয়। ভবিষ্যতেও থাকবে, কারণ তার জীবনবাদ প্রহেলিকাময়, তাই অফুরন্ত সম্ভাবনার উষর ভূমি। 'উষর' এই অর্থে যে, তার রচনায় এমন সব অভিনব ধীকল্প, এমন সব স্বেচ্ছাকৃত বিভ্রান্তিকর উক্তি আছে, সৃষ্টিছাড়া রূপকের হেঁয়ালি প্রয়োগে, উপমার একাধিকার্থক ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত আছে যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী বলে প্রতিভাত হয়, এবং যাদের তাৎপর্য-অন্বেষণ উষর জমিতে ফসল-ফলানোর মতোই কঠিন। তার একটা দৃষ্টান্ত: তাঁর মতবাদে হাঁ-ধর্মিতা ও না-ধর্মিতা (মনঃসমীক্ষণে যাদের যথাক্রমে বলে biophilia এবং necrophilia— জিজীবিষা ও মুমূর্ষা)

---

১. "ছোটো ও বড়ো", কালান্তর, পৃ. ১০৭

সহাবস্থিত। ফলে, তাঁর জীবনবাদ যেন ত্রিবেণী সংগম— গঙ্গাধারার সঙ্গে কালো যমুনার মিলন— মানুষের আত্মক্রান্তির প্রতিশ্রুতি, তার নব নব স্বরূপ-সৃজন, প্রতি মুহূর্তে মরণ এবং প্রতি মুহূর্তে নবজীবন। এই কারণেই R. J. Hollingdale -এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "…the sense one has that the play and counter-play of ideas in it has, even theoretically, no end. And since this is a faithful reflection of what is the case— since the problems he treats of probably really are irresolvable— his work has retained its immediacy, freshness and relevance while that of almost all his contemporaries has become of historical interest only."[১] তাঁর ভাব-ভাবনাগুলির মধ্যে বিচিত্র বৈপরীত্য এমনি ধরনের যে তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনোদিনই চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌছনো যাবে না। তাই, পরম্পরাক্রমে বিশেষ বিশেষ ভাষ্যের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনবাদ চিরনূতন হয়ে থাকবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, তৎকালীন জ্ঞানীসমাজে যে মূল্যায়ন প্রচলিত ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকেই ভিত্তি করে উপরে উদ্ধৃত মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কবি যে-ইন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছিলেন, (জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক) সেই ইন্দ্রনাথ নীট্‌শে-নির্দিষ্ট ক্রান্তপুরুষের ভাবকল্প। তাই তাকে বাস্তবে খুঁজতে গেলে বিফল হতে হবে। সে সাহিত্যের সত্য, বাস্তবের তথ্য নয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কবি-সৃষ্ট ইন্দ্রনাথ নীট্‌শে-সৃষ্ট নবমূল্যায়নের ক্রান্তপুরুষের তুলনায় পূর্ণাঙ্গপ্রায় ভাবমূর্তি।

নীট্‌শে মানুষকে ভাগ করেছেন তিন শ্রেণীতে। প্রথম শ্রেণী যারা তারা সাধনোত্তীর্ণ ক্রান্তপুরুষ। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মানুষ আত্মক্রান্তির সাধনপথে এখনো চলিষ্ণু; কিন্তু তাদের সাধন-প্রয়াসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আছে: দীক্ষাগুরুর ভূমিকা— যারা আজও গণ্ডিবদ্ধ জীবন-বিলগ্ন তাদের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করা। তৃতীয় শ্রেণীতে আছে তারাই যারা 'সাধারণ'-এর পর্যায়ে পড়ে; তারা আত্ম-ক্রান্তির দুঃসাধ্য ব্রতপালনে অসমর্থ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদের মৌলিক

---

১. *Nietzsche*, Routledge & Kegan Paul, 1973, p. 18

স্বীকার্য : সকল মানুষের মধ্যে অসাধারণত্বের সম্ভাবনা মুকুলের মতো অস্ফুট আকারে আছে ; প্রযত্নবতী সাধনার সাহায্যে তাকে প্রস্ফুট করাই মানবধর্ম। এই ধর্মপালনের রুদ্র শক্তি তাদের ব্যক্তিত্বের অন্তরে অঙ্কুরের মতো নিহিত আছে ; কিন্তু এ কথা তারা জানে না। জানে তখনই যখন ডাক আসে অসাধ্য সাধনের। তখন আজকের 'সাধারণ' মানুষ কালকের 'অসাধারণ' মানুষ হয়ে ওঠে। রক্তকরবীর কাঙুলাল একদিন তো ছিল সাধারণ মানুষ ; তার মতো সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে ওঠে, জড়জয়ী বিদ্রোহের মন্ত্র তখন তার মুখে।

ইন্দ্রনাথের শক্তি ছিল সাধারণত্বের অন্তরে অসাধারণত্বকে, সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে জাগিয়ে তোলার। নীট্‌শেবাদে সাধারণ ব্যক্তিমানস দেনা-পাওনা ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব মেলাতেই ব্যস্ত ; তাদের পিছন-চাওয়া মনোভাবে কী করে গতি-সঞ্চার সম্ভব? তাই তারা স্থিতিশীল। কিন্তু ইন্দ্রনাথের কাছে প্রত্যেক সাধারণ ব্যক্তিমানস অসাধারণত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে যদি তেমন করে ডাকা যায়। ইন্দ্রনাথের চোখে সাধারণ ব্যক্তিমানস কেবলমাত্র স্থিতিশীল সামান্য সৃষ্টি নয়, তার মাঝেও আছে সুপ্ত নির্ঝরের অন্তরে গতিবেগের সম্ভাবনা, রুদ্ধদ্বার সসীমের বুকে উন্মুক্ত অসীমের শিহরণ।

নীট্‌শের জীবনবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গত উল্লেখ্য : আত্মক্রান্তি, দুর্গম ক্রান্তিপথ এবং ক্রান্তপুরুষের অভ্যুদয়। নীট্‌শের মূল প্রশ্ন : "Man is something that should be overcome. What have you done to overcome him?"[১] যেটা মানুষের গুহাহিত স্বভাবধর্ম বলে গৃহীত সেই আত্মক্রান্তির প্রয়াস কোথায়? সেই প্রয়াসই তো মানুষের আত্মপরিচয়। আত্মপরিচয়কে প্রস্ফুট করবার জন্য তুমি কী করেছ?

সৃষ্টিতে সৃজনকার্য চলছে অবিরাম। মানুষের মধ্যেও সেই সৃজনের লীলা। লীলার তাৎপর্য গুহাহিত, কিন্তু মানবমনের কাছে উন্মোচ্য। যেদিন এই সত্যের ইশারা অন্তরে ধরা পড়বে, সেদিন ব্যক্তিমানসের মধ্যে আত্মবোধের উন্মেষ ঘটবে : আত্মক্রান্তির প্রথম পদক্ষেপ, আত্মসৃষ্টির প্রথম প্রয়াস। আত্মবোধের লক্ষণ হল : সসীমতার কারাকক্ষে তার বাধাবন্ধনের উপলব্ধি এবং বাধাবন্ধন-অতিক্রমণের মধ্য

১. *Thus Spoke Zarathustra,* **Translated by R. J. Hollingdale, Penguin Books, 1964, p. 41**

দিয়ে অসীম সম্ভাবনার রূপায়ণ। তার সীমায়িত দৈনন্দিন জীবনের পৌনঃপুন্য তার কাছে যখন অসহনীয় হয়ে পড়ে, তখন সে ইচ্ছা করে

"…নিশার আঁধারস্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে
এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা—"

—"মানসসুন্দরী", সোনার তরী

সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ : এটাই তখন তার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তটাই চরম গুরুত্বপূর্ণ। তার অন্তর অসীমের আহ্বান শুনতে পায়। সে অস্থির। সে সাড়া দিতে চায়। প্রাণের বেদনা, প্রাণের আবেগ আর চার-দেওয়ালের মাঝে সে বন্দী করে রাখতে পারে না। তখন "ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা"— এই তার আত্মবিদ্রোহের সংকল্প এবং তারই ফলশ্রুতি : স্বাধীনতার শক্তি যার অপর নাম আত্মশক্তি ; নিজ অস্তিত্বের সীমারেখাকে কেবলই অতিক্রম করবার শক্তি। মানুষের কাছে দুটি বিকল্প : হয় পৌনঃপুন্যের স্থিতি, নয় আত্মক্রান্তির গতি। যে গতিকে বেছে নেয়, সংকট-সংশয় অবরোধ পায়ে দ'লে তাকে চলতে হয় ; সংঘাত থেকে সঞ্জাত উপচীয়মান আত্মশক্তির অধিকারী সে। তার জন্য বারংবার অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন। নানাবিধ অগ্নিপরীক্ষা : কাপুরুষতার ঈর্ষা, তিলোত্তমার মোহিনী মায়া, সুখভোগ আরামের বর্ধিষ্ণু প্রলোভন, অন্তঃসারশূন্য স্ফীতকায় অহমিকা, অজস্র নিন্দার মুখর বরিষন, বিদ্রূপের নিষ্ঠুর হাসি, অজানা বিপদের গুপ্ত গহ্বর। এত বাধা, এত মায়াজাল— এ কিসের জন্য ; এর তাৎপর্যই বা কী ? তাৎপর্য শুধু একটাই : নিবাত-নিষ্কম্প নিষ্ঠার মাপনী। পরীক্ষায় যদি বিফল হয়, বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে সংকল্প, তার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না। এই বিফল-প্রয়াস মানুষ জরথুস্ট্রের কাছে বন্দনীয় ; কেননা তার সাধনা বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করা। এই মোকাবিলা দুঃসাধ্য ব্রত। তাতে যদি মৃত্যুকেও বরণ করতে হয় সে দ্বিধা করে না, মৃত্যুর ভিতর দিয়েই সে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে বেঁচে থাকে। এবংবিধ সর্বান্তঃকরণ প্রচেষ্টাতেই আছে আত্মশক্তির প্রতিশ্রুতি।

যারা স্থিতিকে বেছে নেয়, তারা ভীরু, কাপুরুষ। অসীমের আহ্বানে তারা কান দিতে ভয় করে, কারণ সেই আহ্বানে আছে চরিষ্ণুতার দাবি—

শুধু 'চরৈবেতি'। তারা চায় ঝামেলাবিহীন মায়াবনবিহারী জীবনযাপন। তাদের সম্বন্ধে কবির কথায় বলা যায় :

"মরণকে তুই পর করেছিস ভাই,
জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই।"

—গীতবিতান ১, পৃ. ২৩৯

'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' যারা ভাগ্যের দান বলে স্বীকার করে নেয়, তারাই প্রকৃত দুর্বল-চিত্ত, তারাই সাধন-বিমুখ। তারাই সাধারণ ব্যক্তিমানস। যে-মানুষেরা ভাগ্যের পুতুল হয়ে বেঁচে থাকতে চায়, তারা জৈবত্বের সীমারেখার মধ্যে এখনো বন্দী, মনুষ্যত্বের চিন্ময় সম্ভাবনার কথা তারা স্বভাবতই ভাবেও না। তারা ছোট্ট পরিসরের জীব, ছোট্ট তাদের চিন্তা-ভাবনা, গণ্ডি, ছোট্ট তাদের মন। তারা জানে না 'ভূমৈব সুখম্'-এর কী অর্থ হতে পারে।

যার প্রাণে অসাধারণত্বের ডাক পৌঁছয়, যে সাধন-পথে পা বাড়ায়, তার জন্য গোপনে প্রতীক্ষা করে আছে 'গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা'। তার 'সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট' যে-কোনো আক্রমণের যে-কোনো আঘাতের সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। সে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে। সে 'কালসমুদ্রের আলোর যাত্রী', 'ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে'ও তার অন্তরপ্রদীপখানি অনির্বাণ, সে বাঁধন-ছেঁড়ার সাধনোত্তীর্ণ, সে ক্রান্তপুরুষ। তার ত্যাগেই ভোগ, স্থিতিতেই গতি, বজ্রেই বাঁশি। নীট্‌শের জরথুস্ত্র বলেছে : "Where is the lightning to lick you with its tongue? Where is the madness with which you should be cleansed? Behold, I teach you the Superman : he is this lightning, he is this madness."[১] যত জঞ্জালজাল, যত বিশীর্ণ বিবর্ণ জীর্ণ অর্থহীন সঞ্চয়—সব দগ্ধ হয়ে যায় ক্রান্তপুরুষের তড়িৎ-শিখাবৎ প্রতিভায়। তার অসামান্যতা সাধারণের চোখে সৃষ্টিছাড়া খ্যাপামি, শুধু উপহাসের খোরাক; কারণ, তার আহ্বানের মধ্যে আছে অলোভের লাভ, মাধুরীহীন উদয়দিন। তার অভ্যুদয়ের পথ দুর্গতোরণের ভগ্নাবশেষের উপর দিয়ে; তার কণ্ঠে নূতন জন্মের নূতন জীবনের

---

১. *Thus Spoke Zarathustra* : **Translated by R. J.** ***Hollingdale*** **Penguin Books, 1964, p. 43**

নূতন মানবোধের রুদ্র বাণী, চিন্তাধারায় বিপ্লবের ডাক, মানসমণ্ডলে ঘূর্ণিঝড়ের শঙ্খধ্বনি। শিকল-ভাঙা 'মরুশ্মশানসঞ্চর' ক্রান্তপুরুষের বহ্নিমান অভ্যুদয়, আরাম-ভাঙানিয়া রণসজ্জায় আগুন-রাঙা রূপ।

এই শুষ্ক রুক্ষ রুদ্র নির্মোহ আত্মক্রান্তির সাধনা মানুষের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ— অসাধারণত্বের দাবি। মানুষ কি পারবে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে? যাদের উত্তর হবে নেতিবাচক যারা পিছিয়ে যাবে ভয়ে, তারা কাপুরুষ। তাদের স্থান গড্ডলিকায়। গড্ডলিকার মানুষ দুর্বলচিত্ত সংকীর্ণচেতা ঈর্ষাপরায়ণ পরশ্রী-কাতর প্রতিভাদ্বেষী। যার প্রতিভায় আছে অগ্নিদীপ্ত সাহস ও শৌর্য, দুর্গম সাধনমার্গের অভিযাত্রী হবার যোগ্যতা একমাত্র তারই।

নিজের সম্বন্ধে নীট্‌শে বলেছিলেন: "I am no man, I am dynamite."[১] জনান্তিকে বলা যেতে পারে, ইন্দ্রনাথ অতীন্দ্র-চরিত্রের বর্ণনায় ঐ শব্দটি ব্যবহার করেছিল, বলেছিল: "ঐ যে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে— ওর প্রতি তাই আমার এত ঔৎসুক্য" (পৃ. ৩৭)। এই অর্থে সত্যই নীট্‌শে ডাইনামাইট। কেন, তার কারণ দেখিয়ে Geoffrey Clive লিখেছেন: "His dazzling psychological insights and his devastating destruction of cant are in constant tension with his aim to overcome nihilism and to save the modern soul not only idolatry of false prophets but also from the tyranny of absolute cognition yielding a meaningless universe in which to be alive."[২] তাঁর প্রখর অন্তর্দৃষ্টির কাছে সত্যই কোনোরকম ভণ্ডামিই আত্মগোপন করে থাকতে পারে নি। আবার, এই দৃষ্টির সঙ্গে যখন যোগ দেয় নীট্‌শের জেহাদ-প্রবণতা, তখন তো

---

১. Frederick Nietzsche, "Ecce Homo", *On the Genealogy of Morals and Ecce Homo*, Translated by Walter Kaufmann : Vintage Books, 1967, p. 326

২. "Introduction", *The Philosophy of Nietzsche*. Geoffrey Clive (ed.), The New American Library, 1965, p. ix

বহ্নিবর্ষণ, তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হল হরেক রকম বাগীশ; যেমন, ধর্ম-পুরাণবাগীশ সর্ব-ধ্বংসবাগীশ স্থূল-বস্তুবাগীশ, বিমূর্ত-যুক্তিবাগীশ ইত্যাদি। জীবনের সার্থকতা কোথায়, অস্তিত্বের অর্থ কী, সত্তার তাৎপর্য -অন্বেষণ কেন: এই শ্রেণীর প্রশ্নের উত্তর চায় ব্যক্তিমানস। এই প্রশ্নগুলির উত্তরই যদি মানুষ না পেল, তা হলে ঐ-সব বাক্যবাগীশদের বাক্যের আর কী মূল্য থাকতে পারে? অবশ্য একটা মূল্য আছে: তাদের অন্তঃসারশূন্য 'হিং টিং ছট্' -জাতীয় স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ভস্মস্তূপ হতে আবির্ভূত হবে নূতন মানবিক জীবনবাদ, নূতন দিগ্‌দর্শনের অঙ্গুলি-সংকেত।

নীট্‌শের অন্তরতম অভিলাষ ছিল, প্রচলিত ভাপসা ঘুণধরা শ্যাওলা-পড়া সাবেকী সমাজব্যবস্থার ভিতটাকে তাঁর শক্তিতত্ত্বের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিতে। তার কল্পনায় ছিল এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে গড্ডলিকা-প্রবাহের দৈনন্দিন ঈর্ষা-কলহ-ক্ষুদ্রতার কালিমা থাকবে না, থাকবে না কাপুরুষের প্রতিপত্তি। কাপুরুষের একমাত্র লক্ষ্য: উপরকে নীচে নামানো, ঊর্ধ্বগতিকে প্রতিহত করা। তাই তিনি বলেছেন: "Life is a fountain of delight; but where the rabble also drinks all wells are poisoned."[১] কাপুরুষের সংস্পর্শে সবলও দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, কথায় বলে: A man is known by the company he keeps.

মানুষের আত্মশক্তিকে প্রকাশ করার নামই প্রতিভা। আপন সঞ্চীয়মান আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা প্রতিভার লক্ষণ। মানুষের ইতিহাস প্রতিভার বৈপ্লবিক অভ্যুদয়ের কাহিনী। বর্তমান মানুষ এক বিষম দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন। আত্মরক্ষার একটি মাত্র পথ: এক নূতন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রবর্তন। যারা এই সংস্কৃতির প্রবর্তন করবার যোগ্য তাদের সম্বন্ধে নীট্‌শে বলেছেন: "For these people who are of any concern to me, I wish them suffering, loneliness, disease, ill-treatment, degradation— I want them to know the feeling of a profound self-content, the tormenting lack of self-confidence, the misery of the vanquished. I have no pity for them, because, I wish them the only

১. "Of the Rabble", *Thus Spoke Zarathustra*, p. 120

thing in existence that can prove if any man has value or not— the ability to hold his own."[১]

কঠিনতম ব্যাঘাত, দুঃসহ দুর্দৈব, দুঃখ-নিন্দা-অপযশ : সব-কিছু তাদের মাথায় ঝরে পড়বে, তবু কর্তব্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, তবু হাল-না-ছাড়ার দৃঢ় পণ। কবির বাণী মনে পড়ে :

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ, ওরে সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা—
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

—'বলাকা', ৪৫

এমন দুঃখে-নিন্দায়-অবিচলিত নিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ভাবালুতার মোহমুক্তি। যা হৃদয়কে দুর্বল করে, সংকল্পকে নতজানু করে, সেটা শক্তিসাধনার প্রতিকূল। এমন অনেক হৃদয়বৃত্তি আছে যেগুলো মানবিক গুণ বলে কীর্তিত স্বীকৃত গৃহীত হয়েছে ; যেমন, স্নেহ প্রেম মায়া মমতা সু-কু-বোধ বিনয় সহিষ্ণুতা ইত্যাদি। যতক্ষণ এরা হৃদয়দৌর্বল্যের কারণ না হয়, ততক্ষণ এদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণ আত্মক্রান্তির লক্ষণ ব'লে বিবেচিত হয়। কিন্তু যখনই প্রগল্‌ভ প্রবঞ্চনাত্মক ভানবিলাসিতা এদের মুখোশ প'রে আসরে নামে, তখনই দ্বন্দ্ব বাধে আত্মপ্রবঞ্চনা এবং আত্মপরিচিতির মধ্যে। যেমন, দুর্বলের হুমকি : যখন দুর্বল সবলকে বলে, "ক্ষমা করলাম", তখনই ক্ষমার মর্যাদা প্রহসনে পরিণত হয় ; কেননা বক্তার মুখে আস্ফালন, মনে মনে পিছু-হটার পরিকল্পনা। ক্ষমা শক্তিমানের, বিনয় গুণবানের, ত্যাগ ঐশ্বর্যবানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এরাই সত্য (অস্তিবাদে যাকে বলা হয়

---

১. Ivo Frenzel, *Frederick Nietzsche*, tr., Joachim Neugroschel, Pegasus, New York, 1967, p. 111

authenticity) আত্মপরিচিতির অভিজ্ঞান। কবির মহর্ষি বাল্মীকি সত্য পরিচয়ের লক্ষণ বিচিত্র-সুন্দর রূপে প্রকাশ করেছেন। "বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ মহর্ষি বাল্মীকি" মহর্ষি নারদকে প্রশ্ন করেন :

"কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা-মাঝে দুঃখ মহত্তম—"

—"ভাষা ও ছন্দ", কাহিনী

এই লক্ষণ-সমষ্টি যার মধ্যে প্রতিভাত হবে, সে মহর্ষি বাল্মীকির কাছে "নরচন্দ্রমা"।

"দেবেষপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতম্।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যোযুক্তো নরচন্দ্রমা।"

—প্রাচীন সাহিত্য, পৃ. ৮

এও তো এক ক্রান্তপুরুষের ছবি! মহর্ষি তাঁর ছন্দে গানে এই নরচন্দ্রমাকে দেবতা ক'রে তুলবার অভিলাষী। কিন্তু বাস্তবে কোথায় সেই নরচন্দ্রমা? অবশ্য দাবিদার অনেক আছে। তারা নকল, বেআইনী দখলদার। এই নকলনবিসরা স্বভাবে স্যাঁতসেঁতে। তাই লক্ষণগুলো জোলো হয়ে পড়ে। তাদের ভিজে প্রভাব থেকে মুক্ত রাখাই শক্তিব্রত মানুষের গুরু দায়িত্ব। শক্তিসাধকের উদ্দেশে নীট্শের উপদেশ : "You must be ready to burn yourself in your flame : how could you become new, if you had not first become ashes ?"[১] আত্মপ্রবঞ্চনার দাহনশেষের ভস্ম থেকেই তো সত্য পরিচয় উদ্ভূত হয়; তার দিব্য বিভা যেন 'রাঙা আলোর মশাল'।

এই শক্তিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানস বিশ্লেষণ করবার

১. "Of the Way of the Creator", *Thus Spoke Zarathustra*, p. 90

প্রয়োজন। ইন্দ্রনাথ জ্ঞানী গুণী মানী কৃতবিদ্য পুরুষ। "দেশের ছাত্রেরা তাঁকে মান্‌ত রাজচক্রবর্তীর মতো। অসাধারণ তাঁর তেজ, আর বিদ্যার খ্যাতিও প্রভূত" (পৃ. ১০)। ইউরোপ থেকে সে সায়ান্সে খ্যাতি অর্জন ক'রে এসেছে। যোগ্যতা অনুসারে "যথেষ্ট উঁচুপদে প্রবেশের অধিকার তাঁর ছিল; য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের প্রশংসাপত্র ছিল উদার ভাষায়" (পৃ. ১৫)। এ-হেন ইন্দ্রনাথ অত্যন্ত আত্মাভিমানী হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। অহংকার তার শোভা পায়। সুদূর বিদেশে সে খ্যাতি ও সাফল্য লাভ করতে পেরেছে। সেই কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তার পুরুষকারের। কুল, দৈব বা অনুগ্রহের আনুকূল্য তার সাফল্যের পথকে মসৃণ করে দেয় নি।

জ্ঞান গুণ রূপ চরিত্রবল: সকলের সম্মিলিত প্রভাবে ইন্দ্রনাথ এমন একটা ঋজু লৌহকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছে যার মধ্যে "...আছে একটা কঠিন আকর্ষণশক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ও অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে" (পৃ ২১)। অদ্ভুত তার আত্মসংযম: "কড়া কথা বলতে বাধে না, কিন্তু হেসে বলে, গলার স্বর রাগের বেগেও চড়ে না, রাগ প্রকাশ পায় হাসিতে।" ইন্দ্রনাথের "দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব।" অটল তার আত্মবিশ্বাস। লোকের কাছে অনায়াসে দুঃসাধ্য রকমের দাবি করতে পারে। সে জানে তার দাবি সহজে অগ্রাহ্য হবে না। ইন্দ্রনাথ দলপতি। সাধারণের কাছ থেকে সে যেন বহু দূরে এক অগম্য শিখরে বিরাজ করে। তার চারি দিকে দুর্বোধ্যতার রহস্যজাল। "কেউ জানে তার বুদ্ধি অসামান্য, কেউ জানে তার শক্তি অলৌকিক। তার 'পরে কারো আছে সীমাহীন শ্রদ্ধা, কারো আছে অকারণ ভয়।"

এমন একজন পুরুষসিংহ যদি দেশে ফিরে জীবিকার পথগুলিকে বন্ধ দেখতে পায় তার মানসিক প্রতিক্রিয়া অনুমান করা কঠিন হবে না। ইউরোপ-প্রবাসকালে ইন্দ্রনাথ একজন "পোলিটিকাল্ বদনামী"র সংস্রবে এসেছিল। এই ঘটনাটি স্বদেশে তার চাকরি পাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। আপন দেশেই জায়গা মিলল না তার। অথচ সে নিশ্চিত জানত: "...অন্য যে-কোনো দেশে সম্মানলাভের শক্তি তাঁর প্রচুর ছিল" (পৃ. ১৭)। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিদেশী সুপারিশে অধ্যাপনার কাজ জুটল বটে, কিন্তু সেও এক "অযোগ্য অধিনায়কের

অধীনে। অযোগ্যতার সঙ্গে ঈর্ষা থাকে প্রখর, তাই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেষ্টা উপরওয়ালার হাত থেকে ব্যাঘাত পেতে লাগল পদে পদে" (পৃ. ১৬)। জনান্তিকে বলা যেতে পারে, কবির এই মন্তব্যের মধ্যে অধুনা-খ্যাত পরিহাস-বিজল্পিত Parkinson's Law নামধেয় তত্ত্বটির কি এক সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় না? অযোগ্যতা এবং ঈর্ষা মিলে যে মারাত্মক রোগটির উৎপত্তি হয় C. Northcota Parkinson যার নাম দিয়েছেন "Injelititis: ফরমূলা হচ্ছে $I_3 J_5$ যেখান I এবং J যথাক্রমে নির্দেশ করে inefficiency এবং jealousy! এই রোগের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে অননুকরণীয় বিদ্রূপাত্মক ভাষায় তিনি বলেছেন: "If the head of the organization is second-rate, he will see to it that his immediate staff are all third-rate; and they will, in turn, see to it that their subordinates are fourth rate."[১] একটি প্রামাণিক তত্ত্ব সন্দেহ নেই! ইন্দ্রনাথের যুগেও যেমন সত্য ছিল, আজও তাই! অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে "অধ্যাপনার চিরাভ্যস্ত চাকা ঘুরিয়ে" জীবনটাকে পেনশনের দরজায় কোনোরকমে পৌঁছে দেওয়া: এমন শিশির-সিক্ত ইচ্ছে ইন্দ্রনাথের মতো আত্মাভিমানী প্রখর-প্রতিভাবান পুরুষের মনে কখনো প্রশ্রয় পেতে পারে না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় কানাই গুপ্তের কাছে যখন সে বলে: "ওরা চার দিকের দরজা বন্ধ করে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো।" (পৃ. ৩৬)

ছোটো জায়গায় তাকে মানায় না, ছোটো কাজের জন্য তার জন্ম নয়, বিরাট সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি আছে তার প্রতিভায়: ইন্দ্রনাথের এই আত্মপ্রত্যয় সুদৃঢ়। প্রকাণ্ড কর্মক্ষেত্রই তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ-স্থান। প্রাত্যহিকের বাঁধাধরা নির্জীব জীবনে তার পথিকৃৎ পুরুষকার কখনো আত্মতৃপ্তির পথ খুঁজে পাবে না। রাষ্ট্রবিপ্লবের ঐতিহাসিক বিক্ষোভের মাঝে সে খুঁজে পেল তার শক্তি-সাধনার যজ্ঞভূমি, আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র। ইন্দ্রনাথের এই বড়োত্বের স্বপ্ন ও সাধনা: এটা নীট্‌শের ক্রান্তপুরুষের চরিত্রগুণ। তাই দেখা যায়, যা-কিছু সাধারণ হৃদয়দৌর্বল্য

---

১. *Parkinson's Law or the Pursuit of Progress*: John Murray, 1961, p. 108

তার প্রতি ইন্দ্রনাথের তাচ্ছিল্যভরা ঔদাসীন্য। দুর্বল নমনীয় পেলব চরিত্রের প্রতি তার নির্মম অবজ্ঞা। তারা কাপুরুষ। তাদের জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। অমন ব্যক্তিত্বহীন বীর্যহীন জীব সাধনার পথে বিঘ্ন। পথ হতে তাদের সরিয়ে ফেলার মধ্যে নিষ্ঠুরতা থাকতে পারে, কিন্তু নীতিভ্রংশ নেই! শক্তি-উপাসনার দীক্ষা শুরু হয় নিষ্ঠুরের সাধনায়। "শক্তির গোড়ায় নিষ্ঠুরের সাধনা, শেষে হয়তো ক্ষমা" (পৃ. ২০)। শক্তিতত্ত্বের ভাষ্য শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে এলা ইন্দ্রনাথকে বলে: "আপনি নিষ্ঠুর!" এতে কিন্তু ইন্দ্রনাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। তার নিষ্ঠুরতার সমর্থনে যুক্তি দেখায়: "কেননা মানুষকে যে বিধাতা ভালোবাসেন তিনি নিষ্ঠুর, জন্তুকেই তিনি প্রশ্রয় দেন" (পৃ ২২-২৩)। নীট্‌শের উক্তি মনে করিয়ে দেয়: "There is nothing so merciless as the mercy of God." শিষ্যদের প্রতি ইন্দ্রনাথের নির্দেশ: "দয়ামায়ার জলাজমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙায়" দাঁড়াতে হবে। সেখানে অনুকম্পা প্রেম স্নেহ মমতা এই ভাবালু হৃদয়বৃত্তিগুলির প্রবেশাধিকার নেই। কর্তব্য সাধনের প্রয়োজনে নির্মমতা বাঞ্ছনীয় এবং সংগত। দয়ামায়া বিসর্জন দেবার স্বপক্ষে গীতার নজির দেখিয়ে ইন্দ্রনাথ এলাকে উপদেশ দেয়: "শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন। নির্দয় হবে না কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে" (পৃ. ২৭)। বিপদ যে-কোনো দিক থেকে যে-কোনো সময়ে আসতে পারে। "সমস্ত নিদারুণ সম্ভাবনা প্রত্যহ কল্পনা করে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে" (পৃ ২৮)। ইন্দ্রনাথের এই অনুশাসন। প্রস্তুতির একটা কঠিন পরীক্ষা হল: যা-কিছু প্রিয়, প্রয়োজন হলে নির্মোহ মন নিয়ে তাকেও বিনাশ করা। এই পরীক্ষায় এলার যোগ্যতা যাচাই করবার জন্য ইন্দ্রনাথ তাকে অতীন্দ্র সম্বন্ধে সোজাসুজি প্রশ্ন করে: "যদি কখনো সে আমাদের সকলকে বিপদে ফেলে, তাকে নিজের হাতে মারতে পার না?"

ইন্দ্রনাথের শুষ্ক রুদ্র জীবনবাদে দু-একটা কমনীয় হৃদয়বৃত্তির যে একেবারে ঠাঁই নেই তা নয়। কিন্তু যে-মুহূর্তে সে হৃদয়বৃত্তি কর্তব্যবোধকে ঘোলাটে করে দেয়, তখনই সেটা গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। প্রেম সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথের ধারণা এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। নারী শক্তিরূপিণী। শক্তির সাধনায় নারী প্রেরণার উৎস। এলাকে উদ্দেশ করে বলে: "তোমরা ব'লে থাকো—মেয়েরা মায়ের জাত, কথাটা গৌরবের নয়। মা তো প্রকৃতির

হাতে স্বতই বানানো। জন্তুজানোয়াররাও বাদ যায় না। তার চেয়ে বড়ো কথা তোমরা শক্তিরূপিণী, এইটেকেই প্রমাণ করতে হবে দয়ামায়ার জলাজমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙায়। শক্তি দাও, পুরুষকে শক্তি দাও" (পৃ ২০)। মেয়েরা প্রেরণার উৎস ব'লেই ইন্দ্রনাথ তাদের দলে টেনে এনেছে। এটা তার আগুন নিয়ে খেলা। কানাই গুপ্ত যখন জানতে চায় এলার মতো সুন্দরীকে কেন সে দলে আনল, ইন্দ্রনাথ উত্তর দেয় : "কানাই, এতদিনে আমাকে তোমার বোঝা উচিত ছিল। আগুনকে যে ভয় করে সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না। আমার কাজে আমি আগুনকে বাদ দিতে চাই না" (পৃ ৩৪)। নেভানো মন নিয়ে দেশের সেবা চলে না; এটা ইন্দ্রনাথের কাছে একটা মৌলিক স্বীকার্য। সেইজন্যে মেয়েদের হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটার প্রয়োজন। সেই ফোঁটা ছেলেদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। "আমরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী নই। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করি নে, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি" (পৃ. ২৫)। কিন্তু বেদীতে বসে কামিনী যদি অসম্বৃত আচরণ শুরু করে, যদি কর্তব্যে প্রেরণা না দিয়ে মন-পোড়ানোর কাজে লাগে, তখন সেই কামিনীবিশেষ বিপজ্জনক এবং অবশ্য-বর্জনীয়। ইন্দ্রনাথের কাছে ভালোবাসার সার্থকতা কর্তব্যসাধনের প্রেরণায়, আত্মসুখসন্ধানী ভোগ-লিপ্সায় নয়। সুতরাং ভালোবাসাও এক শুষ্ক রুদ্র-রূপের সাধনা যা কেবল অসাধারণ ব্যক্তিমানসের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু এই উত্তুঙ্গ আদর্শের চূড়া থেকে ভালোবাসা যখন নেমে আসে সংসারলিপ্সার সমতলভূমিতে তখন সে হয় হৃদয়-দৌর্বল্যের উৎস। তখন সে একটা ছোঁয়াচে রোগের সমগোত্রীয়। সুকুমার ছেলেটি দলের অমূল্য সম্পদ। তাকে ভালোবাসে উমা। পাছে উমার মোহমুগ্ধ ভালোবাসা সুকুমারের "মতো উঁচুদরের পুরুষের মনে বিভ্রম" ঘটায়, তার জন্য ইন্দ্রনাথ উমার বিয়ে ঠিক করে ফেলল। পাত্র ভালোমানুষ নিষ্কণ্টক ভোগীলাল। কারণ "জঞ্জাল ফেলবার সব চেয়ে ভালো ঝুড়ি বিবাহ।" এলা জানতে চায়, এ কি ভালোবাসার শাস্তি। ইন্দ্রনাথ তাকে বুঝিয়ে দেয় : "ভালোবাসার শাস্তির কোনো মানে নেই। তা হলে বসন্ত রোগ হয়েছে ব'লেও শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু গুটি বেরোলে ঘর থেকে বের ক'রে রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোই শ্রেয়" (পৃ. ২৩)। ছোঁয়াচে রোগের স্পর্শে দলের ভিতরে হৃদয়দৌর্বল্যের ব্যাধি অবাধ্য হয়ে বিস্তার লাভ করে,

এ কোন্ দলপতির কাছেই বা কাম্য!

শক্তি-সাধনার অন্যতম লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ শক্তির সঞ্চার করা। নীট্‌শে-প্রবর্তিত শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে চার অধ্যায়ে কবি-ব্যাখ্যাত শক্তিতত্ত্বের এই জায়গাটাতেই একটা মস্ত বড়ো প্রভেদ। নীট্‌শের "rabble" এবং কবির "সাধারণ" স্বভাবসম্ভাবনার দিক থেকে ভিন্নধর্মী। নীট্‌শের "rabble"-এর মধ্যে আত্মক্রান্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। এদিক থেকে নীট্‌শের শক্তিতত্ত্বে নেতিবাচকের আমেজ আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা অনেক স্পষ্ট; সেখানে "সাধারণ"-এর সেই সম্ভাবনা সম্ভাব্যতার এলাকাতে ঠাঁই পেয়েছে। তার কারণ আছে। কবির জীবনবাদে মানুষমাত্রই অমৃতের সন্তান। তাই যদি হয়, 'সাধারণ' মানুষ কেন সেই অমৃতত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? ঘরের কোণে যে ভীরু দুর্বলচিত্ত মানুষটি বসে আছে, অমৃতত্বে তারও অধিকার আছে। তাই সে দুর্বার হয়ে ওঠে যখন সে ডাক শুনতে পায়: "ওঠো, জাগো! তুমি কি জানো না তুমি অমৃতের পুত্র? তুমি কি শোনো নি তোমার মধ্যেও আত্মিক অসাধারণত্ব আছে? আজ লগ্ন এসেছে। প্রমাণ করো, তুমিও সাধারণত্বের গণ্ডি পেরিয়ে সত্তার রাজ্যে পৌঁছোতে পারো!" রুটিন-বাঁধা জীবনের পৌনঃপুন্যের মধ্যে যখন ডাক আসে দুঃসাধ্য সাধনের, তখন তারও মনে অলৌকিক সাড়া জাগে— ছোট্ট নদীর বুক ফুলে ওঠে সমুদ্রের ডাকে।

এমন করে ডাক দেবার ক্ষমতা ছিল ইন্দ্রনাথের। সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে সৃষ্টি করতে পারত তার সম্মোহনী শক্তি। কানাই গুপ্তের কাছে অহংকার করে সে বলে: "তোমাকে তো বাইরে থেকে একদিন দেখতে ছিল সামান্য, কিন্তু তোমার অসামান্যকে আমি প্রকাশিত করেছি। রসিয়ে তুললুম তোমাদের, মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা" (পৃ. ৩৬)। তার আহ্বান যে সাধারণ মানুষের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছয় তার কারণ তাদের কাছে সে কাঙালের মতো কিছুই চায় না। সে তাদের ডাক দেয় "অসাধ্যের মধ্যে, ফলের জন্যে নয়, বীর্যপ্রমাণের জন্যে" (পৃ. ৩৭)। ইন্দ্রনাথের বিশ্বাস: "দাবির জোরেই দাবি সত্য হয়" (পৃ. ২০)। তাই তাদের কাছে সে যখন বীর্যপ্রমাণের দাবি জানায় তারা সংকটের ভয় ছেড়ে সংকোচের বিহ্বলতা কাটিয়ে মদালস আত্মসুখের কুয়াশা-জাল ছিন্ন করে ছুটে আসে, প্রমাণ করতে চায় তারাও বীর। তখন ক্ষয়-ক্ষতি

দুঃখ-দুর্যোগ তাদের দমিয়ে রাখতে পারে না। মৃত্যুকেও তারা উপেক্ষা করে হাসিমুখে। নীট্‌শের জরথুস্ত্রর বাণী মনে করিয়ে দেয়: **"I love him whose soul is lavish, who neither wants nor returns thanks : for he always gives and will not preserve himself."**[১] এর পাশে রাখা যাক কবির বাণী : **"Courage, in the ethics of peace, means the courage of self-sacrifice; there, bravery has for its object the triumph of renunciation."**[২] কত প্রভেদ দুজনের মধ্যে। কিন্তু কোথায় যেন মিলের অনুরণন কানে আসে, ভিতরে প্রবেশ করে।

ইন্দ্রনাথের কাছে জড়ীভূত মনকে ঝাঁকিয়ে তোলার কাজটাই বড়ো : পরাধীন মন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠুক— সেটাই তো চাওয়ার মতো চাওয়া। নিত্য যার অপমান-অবহেলা, সেই পরাধীন দেশের বুকে মরবার মতো সাহস ও শক্তি সঞ্চার করার চেয়ে বড়ো কাজ আর কি হতে পারে! "গোলামি-চাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও যে একটা সুযোগ" (পৃ. ৩৬)। গোলামি-চাপা মনে কালবোশেখী বিদ্রোহের তুফান তোলবার পর কী হবে, ইন্দ্রনাথের কাছে সে প্রশ্ন অবান্তর। হার কি জিত তা বিচার করবে ইতিহাস। ইতিহাস গতি-চঞ্চল। সেখানে উত্থান আছে পতন আছে, হার আছে জিত আছে, কিন্তু ঘুমিয়ে থাকা নেই। যে-সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ইতিহাসের হিসাবনিকাশ চলছে পুরোদমে, তখন শুধু আমাদের দেশটাই "সৌভাগ্যের চিরস্বত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদিতে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবে পরাভবের সমস্ত কারণগুলোর গায়ে সিঁদুরচন্দন মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করতে করতে" নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাবে! সে হয় না। ইন্দ্রনাথ এই ভেবে তৃপ্ত যে, আত্মতুষ্ট সুষুপ্ত দেশটার বুকে এক ঐতিহাসিক জাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য এনে দিয়েছে। এখানেই তার কাজ শেষ।

কিন্তু যারা জাগল, যারা দুঃসাধ্য সাধনের ব্রত গ্রহণ করল, তাদের তো

---

১. *Thus Spoke Zarathustra,* p. 44

২. *Thoughts from Rabindranath Tagore,* Macmillan & Co. Ltd., London, 1938, p. 178

মনে আছে ফললাভের আশা জয়ের স্বপ্ন। থাকাই স্বাভাবিক। কানাই গুপ্তর মুখে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার গোপন কথাটা প্রকাশ পায়: "ফলের লোভ যে আছে আমাদের, তোমার না থাকতে পারে। তোমারই দালালদের মুখে একদা শুনেছিলুম **Elixir of life** হয়তো মিলতে পারে। তোমার এই সর্বনেশে রিসর্চের চক্রান্তে গরিব আমরা ধরা দিয়েছি নিশ্চিত আশারই টানে, অনিশ্চিতের কুহকে নয়। তুমি এটাকে দেখছ জুয়োখেলার দিক থেকে, আমরা দেখছি ব্যাবসার সাদা চোখে" (পৃ. ৩৫)। এই ফললোভী মনোবৃত্তি ইন্দ্রনাথের কাছে নিন্দনীয়। যারা যোগ দিয়েছে মরণপণ সাধনায়, তাদের মন হবে নিষ্কাম। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যদি তারা সংগ্রামে নামতে পারে তবেই তাদের প্রচেষ্টা যথার্থ মহত্ত্বের গরিমায় ভাস্বর হয়ে উঠবে। ইন্দ্রনাথের জীবনবাদে যে একটা নিঃস্পৃহ নির্মোহ নৈর্ব্যক্তিকতা আছে তার প্রধান কারণ: কর্মফলের প্রতি গভীর অনাসক্তি। সাধনাটাই বড়ো: কর্মটাই প্রধান: সংগ্রামই সত্য। তার পরে "মা ফলেষু কদাচন"। সাধারণ জীবনে ফললাভের লোভই হল সমস্ত কর্মের আদিম প্রেরণা। অধ্যবসায়ের অঙ্কুশ। ফলের আশা যখন পরাহত হয়, তখন সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে রিক্তমনা নিরুৎসাহ নিশ্চেষ্ট নির্জীব। কিন্তু যারা এগিয়ে এসেছে বীর্যপ্রমাণের অসাধারণ সাধনায় তাদের কাছে সাধনাই প্রথম ও শেষ কথা। দুরূহ প্রচেষ্টার উদ্দীপনাই তাদের একমাত্র প্রণোদন। বিপ্লবের গহনজটিল ঘনপিচ্ছল পথচলাতেই তাদের আনন্দ। সে পথের শেষে কী আছে, এমন প্রশ্ন তো আত্মঘাতী। ফলের আশাই তো হৃদয়দৌর্বল্য। ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করে, তার শিষ্যেরা ফলচিন্তা বিসর্জন দিয়েই বিপ্লবের পথে পা দিয়েছে। তারা কি জানে না এটা হারের খেলা? নিশ্চিত পরাজয় জেনেও তারা বিপর্যয়ের পথে পা বাড়িয়েছে শুধু অসাধারণ বীর্যপ্রমাণের দাবিতে। এইখানেই তাদের মহত্ত্ব। ফললাভের স্থূল স্পর্শে আবিল হয়ে ওঠে এই মহত্ত্ব। ইন্দ্রনাথ কানাই গুপ্তকে তিরস্কার করে বলে: "তোমরা কি খোকা! মাঝদরিয়ায় যে-জাহাজের তলা গিয়েছে সাত জায়গায় ফাঁক হয়ে, কেঁদে কেটে মন্ত্র পড়ে কর্তার দোহাই পেড়ে তাকে বাঁচাতে পারবে" (পৃ. ৩৭)? এমনতরো হারের খেলায় মহিমা কোথায়? ইন্দ্রনাথ সে মহিমার এক অপরূপ সুন্দর ছবি আঁকে: "তোমরা ক-জনে জেনে শুনে সেই ডুবো-জাহাজেই ঝড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছ,

তোমাদের পাঁজর কাঁপে নি। এমন যে-কজনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই আমাদের জিত। রসাতলে যাবার জন্যে যে-দেশ অন্ধভাবে প্রস্তুত তারই মাস্তুলে তোমরা শেষ পর্যন্ত জয়ধ্বজা উড়িয়েছ, তোমরা না করেছ মিথ্যে আশা, না করেছ কাঙালপনা, না কেঁদেছ নৈরাশ্যে হাউ হাউ ক'রে। তোমরা তবু হাল ছাড় নি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল। হাল ছাড়াতেই কাপুরুষতা— বাস্, আমার কাজ হয়ে গেছে তোমাদের যে-কজনকে পেয়েছি তাদেরই নিয়ে।" (পৃ. ৩৮)

এমন ঘুম-ভাঙানো ভয়-তাড়ানো হাল-না-ছাড়া নিষ্কাম কর্মোদ্যমের মধ্যে কি কোনো যৌক্তিকতা আছে? এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, প্রত্যেক বিপ্লবীকেই নির্মোহ হতে হয়। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সাফল্য কামনায় বিপ্লবী যে-পথ বেছে নিয়েছে সে-পথ নীতির দিক থেকে শ্রেয় কি না এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিপ্লবী সম্পূর্ণ উদাসীন। তার বিশ্বাস: **Ends justify the means.** এ সম্বন্ধে শুচিবাতিকগ্রস্ত হলে তার পক্ষে গোপন বীভৎসার পথে চলাচল অসম্ভব। কারণ সনাতন নীতিবোধের ভিজে-নরম মাটির উপর দিয়ে বিপ্লবের রথ চলতে পারে না। নিষ্ঠুরের সাধনায় নির্মোহ মন অপরিহার্য। কিন্তু এই মোহাবসান শুধু কি কেবল **means**-এর বেলাতেই প্রযোজ্য, **ends**-এর বেলায় নয়? বিপ্লবীর ধ্রুবতারা: লক্ষ্যে পৌঁছনো, তা যেমন ক'রেই হোক-না কেন। লক্ষ্যই তার কাছে একমাত্র আরাধ্য বিগ্রহ, একাগ্রচিত্ত সাধনার একমাত্র বিষয়। লক্ষ্যলাভ অনিশ্চিত, এমন নৈরাশ্যজনক মনোভাব তার কাছে কখনোই আমল পেতে পারে না। হারজিতের প্রশ্নটা তাই বিপ্লবীর কাছে বড়ো: আজ না-হয় হার হল, কিন্তু কাল জিত অবশ্যম্ভাবী। এই আশা বিপ্লবীর মনে অনির্বাণ জ্বলে: ফললাভ তার ভাগ্যে না জুটুক, কিন্তু উত্তরপুরুষ যেন ভোগ করতে পারে। এ বিষয়ে কোনো বিপ্লবীই ইন্দ্রনাথের মতো নির্মোহ নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে না। এইখানেই ইন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য: সে বাস্তব নয়, সে সত্য। মনে পড়ে যায় দেবর্ষি নারদ মহর্ষি বাল্মীকিকে যা বলেছিলেন:

"... সেই সত্য যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

—"ভাষা ও ছন্দ", কাহিনী

সত্য হিসাবে ইন্দ্রনাথ-চরিত্র যুক্তিসংগত। পথ সম্বন্ধে নির্মোহ কিন্তু ব্রত সম্বন্ধে মোহমুগ্ধ: এটা বিপ্লবদর্শনের একটা অন্তর্বৈষম্য। সমস্ত মনপ্রাণ ভরে উঠল লক্ষ্যের চিন্তায়, সব আশা আকাঙ্ক্ষা বেড়ে উঠল লক্ষ্যকে ঘিরে, উদ্দীপিত বিপ্লবী ছুটল লক্ষ্যের অভিমুখে। তার পর সে জানল পরাজয় সুনিশ্চিত: সে নেমেছে আশাহীন কর্মের উদ্যমে। সেই পরিস্থিতিতে তার প্রতিক্রিয়া অনুমান করা কঠিন নয়। ভাঙা আশার ছড়িয়ে-পড়া টুকরোগুলো তখন তার পায়ে বিঁধবে প্রতি পদক্ষেপে। এই নিরাশাই বিপ্লবীর আত্মিক মৃত্যু।

ভাবাবেগের দ্বারা প্রাণিত আন্দোলনের অনেক সময়েই অপমৃত্যু ঘটে। আবেগের আগুন যখন নিভে যায়, উৎসাহ তখন জ্বলুনিশেষের ছাই। এমন অপমৃত্যুর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক আছে। ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্য সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অবহিত। তাই সে চেয়েছে বিপ্লবদর্শনের অন্তর্বিরোধিতাকে দূর ক'রে তাকে যুক্তিগ্রাহ্য শক্ত মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে। সেইজন্য তার বিপ্লববাদে মোহের স্থান নেই কোথাও: না পথের বেলায় না লক্ষ্য-লাভের আশায়। ইন্দ্রনাথ যথার্থই নিষ্কাম কর্মের উদ্যোক্তা। যেখানে ইন্দ্রনাথের সত্যকারের জোর, সেখানেই তার বিপ্লববাদের অভিনবত্ব। তার জোর কোথায় সে কথা কানাই গুপ্তকে বোঝাতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ বলে: "আমি অবিচার করব না, উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর" (পৃ. ৩৯)। তার শিষ্যদের সামনে ইন্দ্রনাথ তুলে ধরেছে বীর্যপ্রমাণের আদর্শ, যে আদর্শে ভাবাবেগের হিস্টিরিয়া নেই, ফললাভের লোভ নেই, হার-জিতের প্রশ্ন নেই, আছে শুধু কঠিন সাধনার নিষ্কম্প সংকল্প। জয়ের লোভে নয়, শুধু দেউলে হবার Sublime আকর্ষণের জন্য। সেই আকর্ষণই তাদের নিষ্কাম কর্মযোগের প্রেরণা জোগায়। এই অভিনব বিপ্লববাদের কাছে ঘৃণা রাগ ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলো দুর্বলতার প্রতীক। শত্রুর 'পরে রাগ ক'রে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে আঘাত হানতে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়। এ যেন মাতাল হয়ে লড়াই করতে নামা। "যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তে পারেই না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি। রাগের মাথায় কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি" (পৃ. ৩৮)। লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ ইন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই সত্যটা স্বতঃসিদ্ধ। তাই তার অনুশাসন: শত্রুকে নির্মোহ মন নিয়েই মারতে হবে,

"রাস্তায় পাথর প'ড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন ক'রে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে" (পৃ. ৪০)। বিদেশী শত্রু ভালো কি মন্দ, সে প্রশ্ন বাহ্য। তাই ইন্দ্রনাথ বলে : "ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে— এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে লড়াতে চেষ্টা ক'রে আমার মানব-স্বভাবকে আমি স্বীকার করি" (পৃ. ৪০)। এটাই হল মুক্তিসংগ্রামের মর্মকথা, প্রতিহিংসার চরিতার্থতা নয়। এই প্রসঙ্গে প্রতিহিংসা-পরায়ণতার সমালোচনা ক'রে নীট্‌শে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটা উল্লেখযোগ্য : **"Thus, however, I advise you, my friends : Mistrust all in whom the urge to punish is strong."**[১]

শত্রুকে ঘৃণা করব না, ফলের আশা ছেড়ে দেব : তবে কোন্ প্রেরণায় সংগ্রাম চালাব বিরাট ক্ষতিকে স্বীকার ক'রেও ? ইন্দ্রনাথের একটাই উত্তর : দুরূহ সাধনার নিষ্ঠুর সৌভাগ্যের আহ্বানে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন জয়ের আশা নিয়ে নয়, যুদ্ধ করাটা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য ব'লে। ইন্দ্রনাথের আশা, তার বিপ্লবী শিষ্যেরা তারই মতো বিশ্বাস করবে : "ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে।" (পৃ. ৩৬)

ইন্দ্রনাথ এবং অতীন্দ্রনাথের মধ্যে এক জায়গায় মিল পাওয়া যায়। দুজনেই বিশ্বাস করে তাদের প্রচেষ্টা শুধু হারের খেলা। যার সঙ্গে গায়ের জোরের পরীক্ষায় নেমেছে, মল্লযুদ্ধে তাকে হারানো সম্ভব নয়। কিন্তু এই পরাজয়ের মূল্যায়নে তাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। অতীন্দ্রের কাছে এই পরাজয়টা গ্লানিকর, শুধু পরাজয় হিসেবে নয়— আত্মার পরাভব ব'লেই। কিন্তু ইন্দ্রনাথ মনে করে এই পরাজয়টাই বড়ো, কারণ তার মধ্য দিয়েই গোলামি-চাপা দেশটার আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা পাবে : "পরাভবের আশঙ্কা আছে বলেই স্পর্ধা করে তাকে উপেক্ষা করে আত্মমর্যাদা রাখতে হবে। আমি তো মনে করি এইটেই আজ আমাদের শেষ কর্তব্য।" (পৃ. ৪০)

ইন্দ্রনাথ একটি অনন্যসাধারণ চরিত্রসৃষ্টি। অহিংসা-শান্তি-সৌভ্রাতৃত্বের কবি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুকম্পা নিয়ে হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবের মূল্যায়ন করেছেন,

---

১ "Of the Tarantulas", *Thus Spoke Zarathustra*, p. 124

তা কেবল রবীন্দ্রনাথের মতো এক অতলাস্তিক মহানুভব মানবিক চেতনার পক্ষেই সম্ভব। মৃত্যু যাদের ভ্রূকুটি করেছে অবিরাম তবু যাদের বুক কাঁপে নি, শিকল-ভাঙার পণ নিয়ে আরাম তুচ্ছ ক'রে যারা দেশের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের অকাতরে উৎসর্গ করেছে : তাদের মৃত্যুজয়ী দুঃসাহসের পিছনে একটা আদর্শের দুর্বার প্রেরণা আছে এ কথা স্বীকার করেছেন কবি এবং এই আদর্শকে অনুবেদনশীল মন দিয়ে রূপায়ণের প্রয়াস পেয়েছেন। বিপ্লবীর ভুলের মধ্যেও যে নিবাত-নিষ্কম্প আদর্শ-নিষ্ঠার বিষাদ-গম্ভীর ভাব আছে, তা বলিষ্ঠ রেখায় রূপায়িত হয়েছে ইন্দ্রনাথ চরিত্রে। 'চার অধ্যায়' যে পক্ষপাত-দুষ্ট সাহিত্যকীর্তি নয়, ইন্দ্রনাথই তার সুসংগত সুসম্বদ্ধ দীপ্তিমান নিদর্শন।

মূল্যায়ন

রবীন্দ্রনাথের এক্‌সপেরিমেণ্ট-প্রবণতা সুবিদিত। তাঁর গল্পে উপন্যাসে কাব্যে প্রবন্ধে গানে চিত্রকলায় এই প্রবণতার স্বাক্ষর আছে অজস্র। যে গতিময় বৈচিত্র্য রবীন্দ্র-রচনার অনুপম বৈশিষ্ট্য তার একটা উল্লেখযোগ্য কারণ হল এক্‌সপেরিমেণ্টের প্রতি কবির আকর্ষণ। রসসৃষ্টির বহুমুখী সাধনায় কবির প্রতিভা ভাবে ভাষায় ভঙ্গিমায় ব্যঞ্জনায় নব নব প্রকাশপথ রচনা করেছে। তাঁর প্রতিটি কীর্তি তাই এক স্বকীয় আত্মতার মর্যাদা দাবি করে সাহিত্যের দরবারে। চার অধ্যায়ের মধ্যেও আমরা কবির সেই এক্‌সপেরিমেণ্ট-প্রিয়তার আভাস পাই। তাই, যেমন ভাবের দিক থেকে তেমনি আঙ্গিকের দিক থেকেও উপন্যাসখানি একটি অভিনব সাহিত্য-কীর্তি।

চার অধ্যায় একটা ছোটো উপন্যাস। ছোটো উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন। বরং শেষের দিকে ছোটো উপন্যাসের প্রতিই তাঁর পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। কিন্তু কি বড়ো কি ছোটো : উপন্যাসের রাজ্যে চার অধ্যায়-এর স্থান স্বতন্ত্র। কাহিনী-বিস্তারের ভঙ্গিমা বিচার করলেই সে কথা প্রতীত হবে।

কাহিনী সাজানো হয়েছে চারটি অধ্যায়ে। এই অধ্যায় কটি ছাড়া একটা ভূমিকাও আছে যেখানে এলার অতীত জীবন বর্ণিত হয়েছে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় যে, চারটি অধ্যায় মূলত চারটি 'দৃশ্য'। কানাই গুপ্তের চায়ের দোকান, এলার শয়নকক্ষ, অতীন্দ্রের অজ্ঞাত-বাসস্থান, এলার বাড়ির ছাদ। সেইসঙ্গে এটাও চোখে পড়ে যে, প্রত্যেকটি অধ্যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ের ঘটনাকাল বেলা প্রায় তিনটে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্‌বোধন অপস্রিয়মান অপরাহ্ণে এবং শেষ অধ্যায় সংঘটিত হয় রাতে। স্থান এবং কালের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে একটি নিটোল চিত্রপট। ছিন্নপ্রায় চটের পর্দা, বিসদৃশ চায়ের পাত্র, দেশবন্ধুর মূর্তি-আঁকা খাতা ; তাঁতে-বোনা সতরঞ্চ, ব্লটিংপ্যাড, পরিত্যক্ত পুরনো পুজোর দালানের সামনে শ্যাওলা-পড়া রাবিশ, মাটির ভাঁড় দিয়ে ঢাকা জলের কলসি, এক ছড়া কলা, এনামেল-উঠে যাওয়া বাটি : যতই তুচ্ছ হোক-না কেন, কোনো বস্তুই অপ্রাসঙ্গিক বলে উপেক্ষিত হয় নি। ফলে, তারা সবাই মিলে

আমাদের সামনে এক পরিচিত আবেষ্টনীর সমগ্রতা সৃষ্টি করে।

দৃশ্য কটির তাৎপর্য এই যে, মূল কাহিনীটি উন্মোচিত হয়েছে তাদের সীমিত পরিসরের মধ্যে। সে পরিসরের বাইরে যাবার প্রয়োজন হয় না। নেপথ্যে যা-কিছু ঘটছে তার খবর পাওয়া যায় চরিত্রগুলির জবানিতে। কে চিরকুট নিয়ে এল, তার সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে না: অতীন্দ্রই জানিয়ে দেয়। বাল্‌বগুলো খুলে নীচতলা অন্ধকার করে রেখে আসে অতীন্দ্র: সে খবর তারই মুখ থেকে শুনি। চরিত্র কটি আমাদের চোখের সামনেই যাওয়া-আসা করে, যা-কিছু বলবার আছে বলে, যা-কিছু করবার আছে করে। এর ব্যতিক্রম যে দু-একবার ঘটে নি তা নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এলার ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে, চল্‌তি ট্রামে লাফিয়ে ওঠে। শেষ অধ্যায়ে সে এলাকে নিয়ে শোবার ঘর ছেড়ে ছাদে যায় আবার ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু এই দু-একটি ব্যতিক্রমের জন্য কাহিনীর দৃশ্যনির্ভরতা কোথাও ব্যাহত হয় নি। সময়-সীমাসহ দৃশ্য-নির্ভরতা একটি নাটকীয় লক্ষণ।

আর-একটি নাটকীয় লক্ষণ হল সংলাপ-নির্ভরতা। চরিত্র কটির আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনা স্বধর্ম-বিধর্ম— সব-কিছুই প্রকাশ পেয়েছে সংলাপের মধ্য দিয়ে। ঘটনা-বিবরণে ও চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখক যেন আগাগোড়াই নেপথ্যবাসী। নাটক ও উপন্যাস: দুয়েরই কাজ হল গল্প বলা। তবে দৃশ্য-নিবদ্ধ চরিত্রদের সংলাপের মাধ্যমে গল্প বলা নাটকের রীতি।

আগে বলা হয়েছে চার অধ্যায়ে নাটকোচিত দৃশ্য-বর্ণনায় স্থান-কাল বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। এটা কি রবীন্দ্র-নাট্যতত্ত্বের বিরোধী নয়? দৃশ্যবর্ণনার গুরুত্ব আধুনিক নাটকের লক্ষণ। রবীন্দ্র-নাট্যতত্ত্বে দৃশ্যবর্ণনা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, একরকমের শিকলরূপী বৈকল্যমাত্র। 'তপতী'-র ভূমিকায় কবি বলেছেন: "আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ-ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ঐ কাব্যটি ছন্দোময় বাক্যের চিত্রশালা। রেখা-চিত্রকর তুলি-হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাঙ্ক-ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তা হলে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে

যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত ; এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।

"শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সে-ই পর্যাপ্ত। আঁকা-ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল ; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত ; অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু, দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব-সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।"[১]

ঈষদ্‌বিস্তৃত উদ্‌ধৃতির মধ্যে রবীন্দ্র-নাট্যতত্ত্বের কয়েকটি ধারণার আভাস পাওয়া যায়। যেমন: প্রথম, কাব্যকলা ও চিত্রকলার মধ্যে যে প্রভেদ নাট্যকলা ও কারুকলার মধ্যেও সেই প্রভেদ। দ্বিতীয়টি যদি প্রথমটির ব্যাখ্যাতা হয়ে আসরে নামে, তবে রসগ্রহণে তার ভূমিকা রাহুর মতো ; দ্বিতীয়, দৃশ্যবর্ণনার কাজ শুধু অকাজের কাজ— দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে লাগাম-পরানো ; তৃতীয়, গতিই নাটকের প্রাণ ; চতুর্থ, অভিনয়ের স্থান মুখ্য কারণ তার প্রাণবান বেগ নাটককে বেগবান করে ; পঞ্চম, নাটক প্রধানত দর্শকের জন্যই, শুধু পড়ুয়ার জন্য নয় ; ষষ্ঠ, নাটক বাস্তব-সত্য এবং ভাব-সত্যের সক্রিয় সমন্বয়— অন্তর্ময় বাহির এবং বহির্ময় অন্তরের প্রকাশ। এই পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যবর্ণনাকে যদি নাটকের লক্ষণ বলে ধরা হয়, তবে প্রথমেই একটি বড়ো রকমের ত্রুটি দেখা দেবে না কি? উত্তর নেতিবাচক। কেননা ঠিক এখানেই রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিনবত্ব : যেটা নাটকের

---

১. র-র ২১, পৃ. ১১৬

দৃশ্য-বর্ণনা বলে ধরা হচ্ছে, সেটাই আবার উপন্যাসের পরিবেশ-রচনার রূপ নিয়েছে। পাঠকের কাছে ভাব-সত্যের কল্পরূপ, দর্শকের কাছে ভাব-সত্যের বাস্তব রূপ। এইভাবে উপন্যাস ও নাটক উভয়েই উভয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট।

Georg Lukacs-এর মতে উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে প্রভেদ এই যে, দুটির মর্মকথা হল যথাক্রমে extensive totality এবং intensive totality।

মার্কসীয় দর্শনে Totality শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজে অনেক খণ্ড খণ্ড শ্রেণীভিত্তিক সম্পর্ক আছে। Totality বলতে এই খণ্ড খণ্ড সম্পর্কসমূহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ব্যাপকতম সমষ্টি বা সমগ্র বোঝায়। সমগ্র গতিময়; নিরন্তর ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হচ্ছে। ভাঙা-গড়ার পিছনে আছে সামাজিক শ্রেণীভিত্তিক সম্পর্কের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। এই সমগ্র এমনই ব্যাপক যে তার বাহিরে কিছু থাকতে পারে না; যদিও বা থাকে সেটা বোধের অগম্য, সুতরাং বাহ্য অগ্রাহ্য অস্বীকার্য। সমগ্র কিন্তু জোড়া-দেওয়া খণ্ড-খণ্ডের গাঁথনি নয়। তার সত্তা স্বকীয়, কারণ সমগ্রের মাঝে সমন্বয় মূর্ত হয়। সমন্বয়ে খণ্ডসমূহের আন্তর্বিরোধিতা তিরোহিত হয়; শুধু তাই নয়, সমন্বয়ে এমন বিচিত্র নবরূপের আবির্ভাব হয় যেখানে খণ্ডগুলি নূতন যাথার্থ্য লাভ করে। যদি জ্ঞান শুধু খণ্ডেই গণ্ডিবদ্ধ থাকে তা হলে খণ্ডের ধারণা খণ্ডিত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। খণ্ড-সমূহকে বুঝতে তাদের আন্তর্বিরোধিতাকে বুঝতে হবে; সেটা বোঝবার জন্য সমগ্রের পরিপ্রেক্ষণ প্রয়োজনীয়। আবার সমগ্রকে বুঝতে হলে খণ্ডের পরিপ্রেক্ষণ ছাড়া বোঝা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।[১]

জ্ঞানের বিষয়ে তাই, কবি যাকে বলেছেন পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব, সেটা অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের epistemology বা জ্ঞানতত্ত্বে খণ্ড-সমগ্রের সম্পর্ক প্রায় একই কাঠামোর— তারা পরস্পরাশ্রয়ী; একটিকে স্বতন্ত্র করে দেখলেই গলদ ঘটে। এই দুটির মধ্যে যে নিবিড় আত্মীয়তা আছে সেটা ভুলে গেলে বোঝবার প্রক্রিয়ায় ত্রুটি দেখা দেয়। কবির ভাষায়: "মানুষ একসঙ্গে সমস্তকে দেখবার চেষ্টা করলে

---

১. দ্রষ্টব্য Lucien Goldmann, *Lukacs and Heidegger : Towards a New Philosophy*. translated by William Q. Boelbower, Routledge and Kegan Paul, London, 1977

সমস্তকেই ঝাপসা দেখে ব'লেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড ক'রে, তার পরে সমস্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এইজন্য কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তবে তার ভয়ংকর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।"[১] পক্ষান্তরে প্রভেদটাও বড়ো, বিশেষ করে গুণগত বলে। কবি খণ্ড-সমগ্র-সম্পর্কের দিগন্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন; এই সম্পর্কের অন্তরে তিনি সত্য-মঙ্গল-শিব-সুন্দরের উদার অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা দেখতে পান, কারণ মানুষের পরমাত্মিক মূল্যবোধ তাঁর কাছে মানবজীবনের পরমার্থ। এখানে বলে রাখা উচিত যে 'পরমাত্মিক' শব্দটি দর্শনের 'পরমাত্মন'-এর বিশেষণ রূপে এই আলোচনায় ব্যবহৃত হচ্ছে না। মানবের যা-কিছু পরম শ্রেয় যা-কিছু পরম প্রেয় যা-কিছু মূল্যোত্তম অর্থাৎ 'Perfection of human relationship'-এর আদর্শ অর্থেই প্রযুক্ত। ব্যষ্টি ও গোষ্ঠী নিয়ে গড়া সমাজের রূপ হল সমগ্র। এই সমগ্রের প্রাণস্পন্দন হল হিতবোধ— নিজ-হিতবোধ এবং সমগ্র-হিতবোধ। কবির কথায়: "... সমগ্র-হিতেই নিজের হিতবোধ মানুষের একটা ধর্ম। এই ধর্ম স্বার্থের বন্ধন কাটিয়ে পূর্ণ-পরিণত হয়ে ওঠবার জন্যে নিয়তই মনুষ্যসমাজে প্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের এই ধর্ম অপরিণত এবং বাধাগ্রস্ত ব'লেই আমরা দুঃখ পাচ্ছি, পূর্ণ মঙ্গলের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ঘ'টে উঠছে না।"[২] কবির সমাজতত্ত্ব বলে: "The history of the growth of freedom is the history of the perfection of human relationship."[৩] সমাজের ইতিহাস আন্তর্মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সমগ্র-হিতবোধের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আর তার উপলব্ধিই মঙ্গলময় মুক্তির উৎস। 'বহু'র মধ্যে 'এক'-এর প্রকাশ, তাই 'এক'-এর একাগ্র নিবেদন: 'আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে'। সাহিত্যের ধর্ম হল— নিজ-হিতবোধ এবং সমগ্র-হিতবোধের মধ্যে সক্রিয় সংযোগ স্থাপন করা। কি করে করবে? উত্তর:

---

১. "সমগ্র", শান্তিনিকেতন ১, পৃ. ৮৯

২. "নিয়ম ও মুক্তি", শান্তিনিকেতন ১, পৃ. ২২১

৩. "Spiritual Freedom", *The Religion of Man*, George Allen & Unwin, 1961, p. 116

"অহংকার স্বার্থ এবং জড়তা যেখানে নিষ্ফল বালির স্তূপ হয়ে পথরোধ করে দাঁড়াবে সেখানে প্রতি মুহূর্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।"[১] ক্ষয়-করা প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণতার যাথার্থ্য অনুভূত হয়। ক্ষয়ের পথ দিয়ে পূর্ণ পরিণতির অভিমুখে যাত্রা : *এইটেই সাহিত্যের সমগ্রতার সাধনা। তাই সার্থকনামা সাহিত্যিকের লক্ষ্য,* **Lukacs**-এর ভাষায়, "**all human integrity and inner greatness**"-কে সৃষ্টি করা ; এক কথায় মানবজীবনে সমগ্রের প্রকাশ যেখানে সকল রসের ধারা আপনহারা হয়ে যায়। এই তো চিরসত্য, সর্বকালের সর্বদেশের সত্য। এটাই তো কবির জীবনসংগীতের বাদীস্বর, সাহিত্যসাধনার গায়ত্রী মন্ত্র।

সাহিত্যের ধর্ম হল : সমগ্রতা সৃজন। উপন্যাস এবং নাটক সাহিত্যের দুটি শাখা বলে তাদেরও লক্ষ্য সমগ্রতা সৃজন। কিন্তু তাদের সৃজনশীলতার মধ্যে গুণগত প্রভেদ আছে। বিস্তীর্ণ পরিসর জুড়ে উপন্যাসের পদসঞ্চার। সে যেন এক মণি-ছড়ানো অজানা পথের সন্ধানে চলেছে— নূতন মণির নূতন হার গাঁথা হবে ; তাই মন্থর তার চলা, কৌতুহল বিকীর্ণ, দূরভেদী দৃষ্টি, পরিব্যাপ্য আবিষ্কার। আবিষ্কারের পরিব্যাপ্তিই উপন্যাসের সমগ্রতার পরিচয়। এই পরিচয়ের বিকাশ পাঠকের চেতনাকে স্পর্শ দৃষ্টির পথ দিয়ে। তাই উপন্যাস নিঃস্বর-ভাষ। তার প্রকাশের বৈশিষ্ট্য হল : লেখক এবং পাঠকের মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন করা— মধ্যে কোনো তৃতীয় নেই। নাটকের বেলায় পরিসর সংকীর্ণ, সময়-সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু তার মধ্যেই তাকে সমগ্রতা সৃজন করতে হয়। সে যেন এক ডুব-সাঁতারু। নিমেষ-গণন তার গতির নিয়ামক। তলাবগাহী তার অন্বেষণ, অন্তর্গভীর আবিষ্কারের তন্ময়তা ; নিমেষে নিমেষে সে অরূপরতন তুলে আনছে, তাকে চলন-বলনের সজীব রূপ দিচ্ছে, সেই নূতন-পাওয়া রূপ দর্শকের চেতনাকে শিহরিত করে তুলছে অফুরন্ত চেনার চমকে। এই তলস্পর্শী তন্ময়তা নাটকের সমগ্রতার রূপ।

Hegel নাটক সম্বন্ধে বলেছেন যে, দ্বন্দ্ব-সঞ্জাত চলন-চাঞ্চল্যই (**'colliding actions'**) নাটকের বৈশিষ্ট্য। নাটক যেটাকে জীবন্ত রূপ দিতে চেষ্টা করে সেটা বিভিন্ন চলিষ্ণু-চঞ্চল প্রবাহের একীভূত সাগরসংগম, **Hegel** যাকে আখ্যা দিয়েছেন **'total movement'**। চলন-চাঞ্চল্যের দুটি দিক আছে : অন্তর ও

১. "হওয়া". শান্তিনিকেতন ১, পৃ. ২৩৩

বাহির। অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্ব চির-পুরাতন, তবুও চির-নূতন। তার কারণ বাস্তব-সত্য এবং ভাব-সত্যের দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তর সমন্বয়ের প্রক্রিয়া ক্রমাগতই চলছে; নিত্য নূতন মরণ নিত্য নূতন জনম। আজকের 'আমি' আর গতকালের 'আমি'-র মধ্যে একদিনের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান আর-একদিনের ক্রমপ্রসারী অভিজ্ঞতার যোগসূত্রে। এইটেই জীবনের গতির উৎস। **Heraclitus**-এর নদীর মতো— একই জলে দুবার ডুব দেওয়া যায় না কারণ নদীর স্রোত বয়েই চলেছে। নাটকেরও গতির উৎস এটাই। তার গতিস্রোতও বয়ে চলে। পিছনে-ফেলে-আসা নিমেষকে কি কেউ— দর্শকই হোক বা অভিনেতাই হোক— আর ফেরাতে পারে? নাটকের দ্বন্দ্বদ্রুত তড়িৎ-গতি নিমেষগুলির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয় প্রবহমান কালস্রোতের কলধ্বনি: এক লয়-বন্দী গানের মধ্যে ক্রান্তবন্ধন মহাসংগীতের অনুরণনের মতো, ঘড়ায়-ভরা মহাসাগরের জলের মতো, ঘটাকাশে মহাকাশের আলিঙ্গনের মতো। এটাই নাটকের স্বকীয় সমগ্রতার পরিচয়। এই পরিচয়ের ক্রমবিকাশ ঘটে দৃষ্টি-বাচন-শ্রবণের পথ দিয়ে। ক্রমবিকাশের ধারাও সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী: তার আঙ্গিক বিশিষ্ট, ভাষা বিশিষ্ট, অলংকার বিশিষ্ট, স্বরমূর্ছনা বিশিষ্ট। নাটক তাই বিশ্বর-ভাষ। সমস্ত মিলিয়ে গড়ে ওঠে নাটকের সমগ্রতা। নাটকীয় সমগ্রতা সৃজনে প্রয়োজন চতুর্জনের— নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা দর্শক। চতুর্জন যখন একই সূত্রে একই সুরে একই মেজাজে মিলিত হয়, তখনই নাটকীয় সমগ্রতার রসোত্তরণ যুগপৎ দৃষ্টি-বাচন-শ্রবণের পথ দিয়ে দর্শকের চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ আপ্লুত করে। এই চতুরঙ্গ মিলনের মধ্যেই নিহিত আছে নাটকের সত্যতা: এক অভিনব মোহানা যেখানে মিশে যায় সত্য ও তথ্য, যেখানে মিলে যায় অন্তর ও বাহির, যেখানে দেখা দেয় এমন এক সমন্বয় যাকে **Hegel** বলেছেন **'at once subjective and objective'**, যাকে রবীন্দ্র-ভাবধারা অনুসরণ করে বলা যেতে পারে বাস্তব-সত্য এবং ভাব-সত্যের ঐকতান। অন্তর ও বাহিরের এমন বৈচিত্র্যময় সমন্বয় সাহিত্যের অন্য কোনো শাখায় অলভ্য।

এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হবে না: রবীন্দ্রনাট্যে রূপকের ভূমিকা। রূপক সাধারণত তত্ত্বপ্রধান এবং সেইজন্য অবাস্তব, বেশ খানিকটা দুর্বোধ্যও বটে। সেখানে গতিচাঞ্চল্যের অভাব, কেননা ভাষার ব্যঞ্জনাবোঝাই তত্ত্বের ভার সাধারণ-মানসের পক্ষে দুর্বহ। তাই তার আদর

মনীষামহলে। সাহিত্যতাত্ত্বিক-দার্শনিক ভাষ্যের অসি-চালনার ক্ষেত্র হিসাবে সে যোগ্য হতে পারে, কিন্তু বিস্বর-ভাষ বেগবান অভিনয়ের উপযোগী নয়। এ ধারণা যে ভ্রান্ত সে সম্বন্ধে দ্বিধা অনেকটাই কেটে গেছে। এটা জানা কথা, রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন সু-অভিনেতা ছিলেন। নাট্যকার ও অভিনেতা যখন একই ব্যক্তির মধ্যে মিলিত হন তখন তাঁর চিত্তদৃষ্টির সামনে থাকে দর্শক। তাই তাঁর লেখনী হতে যে নাটকই উৎসৃত হয় (তা সে যত-তাত্ত্বিকই হোক-না কেন) সেটা যদিও সাধারণ পাঠক্রমে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে, তবু তার বাণী তার আবেগ-আবেদন দরদী মঞ্চাভিনয়ের মধ্য দিয়ে দুর্বোধ্যতার জাল ছিঁড়ে সাধারণ দর্শকের চেতনার গভীরে পৌছবেই। একমাত্র মরমী অভিনয়ই নাটকের ভাষ্য, বিশেষ করে রূপকনাটকের বেলায়। রবীন্দ্র-নাটকে দুটি স্তর। উপরের স্তর বিভ্রম জাগায় : সংলাপের ব্যঞ্জনাপ্রবণ মন্থরতা, দ্বন্দ্বের অস্ফুট ইঙ্গিত ; বলার বাণী বোঝা-না-বোঝার আড়াল দিয়ে স'রে স'রে যাওয়া— যেন পলায়নপরা ছায়া। কিন্তু মন যখন নীচের স্তরে পৌছয় তখন তার চিত্তদৃষ্টির ঘুম ছুটে যায়, সজ্ঞার কাছে সকল অর্থ-তাৎপর্য-মাধুর্য এক পলকে ধরা দেয় ; অন্তঃশীলা দ্বন্দ্ব-দ্রুত গতির অনুভূতি রোমাঞ্চ জাগায় ; দুর্বোধ্যতার অনৈসর্গিক আসন দখল করে নেয় নৈসর্গিক রূপময় তাৎপর্যের প্রকাশ। এখানেই নাটক-পড়া এবং নাটক-দেখার মধ্যে প্রভেদ। মঞ্চাভিনয়ে নীচের স্তর উপরে উঠে আসে আর কাঁপন লাগায় সংরাগে। এই সত্যটি শুধু রবীন্দ্র-নাটকের বেলায় কেন, সব রসোত্তীর্ণ নাটকের বেলাতেই প্রযোজ্য। নাটকের রসোত্তরণের একটিমাত্র পথ : সুবেদী মর্মজ্ঞ সূক্ষ্মানুভূতিশীল অভিনয়।

এক সময়ে ভাবা হত রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকে জনবোধ্য মঞ্চোপযোগিতার অভাব। তত্ত্বপ্রধান নাটকের সফল মঞ্চোপস্থাপনা এখন সে ভুলটা ভেঙে দিয়েছে। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনা করেছেন শুধু মনীষামহলের জন্য নয়, জনসাধারণের জন্যেও, তাদের দেখবার শোনবার আনন্দ-লাভের জন্য। এটা যে ভ্রমাত্মক বক্তব্য নয় সেটা প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাট্যের চরিত্রের মধ্যে জনসাধারণের প্রাধান্য। ধনঞ্জয় দাদাঠাকুর বিশু-ফাগুলাল পঞ্চক অমল-সুধা সুরঙ্গমা অম্বা-গণেশ : এরা সবাই তো জনগণের প্রতিভূ। তাদের যদি কোনো নালিশ থাকে সেটা শ্লথ-চরণ রক্তচক্ষু অচলায়তন-প্রতিম **Establishment**-এর মায়াজাল-বিস্তারের

বিরুদ্ধে; তাদের যদি কোনো অভিযানের উদ্দীপ্ত বাসনা থাকে সেটা ক্ষমতালিপ্সু নেশা-বেসাতি সর্দার-মহাপঞ্চক-রঘুপতি-বিভূতিদের স্বার্থসন্ধ বিপ্রলম্ভের বিরুদ্ধে; তাদের যদি কোনো দাবি থাকে সেটা : "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"; তাদের যদি কোনো অন্তরতম প্রার্থনা থাকে সেটা শুধু আত্মশক্তির প্রার্থনা :

"আপন হাতের জোরে আমরা তুলি সৃজন ক'রে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই ॥"

সরল-স্বভাব ভয়-দুর্বল সংশয়-ম্লান জনমনের গভীরতম আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্মবাণী— এটা যদি তাদের কাছে পৌঁছতে না-ই পারল, তবে রবীন্দ্র-নাটকের রসোত্তীর্ণ সার্থকতা কোথায়! সে কি কেবল মনীষামহলের রুদ্ধদুয়ার কক্ষেই বন্দী হয়ে থাকবে? সুকঠিন সাধন-নির্ভর মানবাদর্শের সুদূর ব্যাকুল বাঁশরির ধ্বনি জনমানসের অন্তস্তলে পৌঁছবে না, সেখানে কি দুয়ার-ভাঙার আলোড়ন জাগাতে পারবে না?

এবার প্রশ্ন : চার অধ্যায়কে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়— উপন্যাস না নাটক? শ্রেণীবিচারের যৌক্তিকতা এই যে, চার অধ্যায় এক অনন্যসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টি। আগেই বলা হয়েছে, চার অধ্যায়ে উপন্যাস ও নাটকের যুগল-মিলন— যেন, 'দুঁহুঁ মন মনোভাব পেষল যনি'। তাই তাকে ঠিক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেললে যেমন অসংগত হবে তেমনি ঠিক নাটকের পর্যায়ে ফেললেও যথাতথ হবে না। কারণ চার অধ্যায়ের একদিকে আছে উপন্যাসের পরিব্যাপ্ত সমগ্রতা, অন্য দিকে নাটকের তন্ময় সমগ্রতা। একদিকে দেখতে পাওয়া যায়, পরিবেশ-রচনার নিটোল ছবি, এলার আবাল্য জীবনকাহিনীর বিবৃতি, অতীন্দ্রের আত্মগত জীবনমূল্যায়ন, কথোপকথনের মন্থর উন্মীলন, বিক্ষুব্ধ সংরাগের অনুমেয় আভাস। এগুলি উপন্যাসের লক্ষণ— লেখক-পাঠকের অমাধ্যমিক যোগসূত্র। অন্যদিকে দৃশ্যনিবদ্ধতার সীমিত পরিসরে দ্রুত-লয়ে মিলিয়ে যাওয়া স্বধর্মহননের দ্বন্দ্ববিধুর সংলাপ এবং নিবিড় উপলব্ধির অকৃত্রিম সততা বা **authenticity** : এগুলি সৃষ্টি করেছে অন্তর্গভীর তন্ময়তা— নাটকের সমগ্রতা। এই সমগ্রতার অনুভূতি উদ্ভূত হয় নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা-দর্শকের দেওয়া-নেওয়ার সূত্রাশ্রয়ী আত্মিক মিলন থেকে।

উপন্যাস হিসাবে চার অধ্যায় পড়বার সময়ে মনে হতে পারে, গতি-চাঞ্চল্যের অভাব, তত্ত্বকথার প্রভাব। পড়তে ভালো লাগে— সেটা মায়াময় ছায়াময় ভাষার গুণে। কিন্তু সেখানেও সমস্যা। ভাবে-ভরা অর্থে-রসালো ব্যঞ্জনা-প্রাণ সংক্ষিপ্তসার শব্দের মেঘে-ঢাকা কুহক-রাজ্য দিয়ে ভাষা চলেছে জটিল সর্পিল পথ বেয়ে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। লক্ষ্যের তাৎপর্য-উদ্ধার-সংকল্পে মনও চলে সেই পথে। তবে এটা কি অলীকভাষণ হবে যদি বলা হয় যে কথোপকথনের সর্পিল পথ-পরিক্রমণের একঘেয়েমি মাঝে মাঝে পড়ুয়া মনের উপর ক্লান্ত আবেশ ছড়িয়ে দিতে চায়?

চার অধ্যায়ের একটি স্বতন্ত্র গুহাহিত আত্মতা আছে। কান পেতে রইলে সেখানে শুনতে পাওয়া যাবে অভিশপ্ত প্রয়াসের চাপা হাহাকার। উন্মোচনের জন্য সেই আত্মতা উন্মুখ হয়ে থাকে সোনার জাদুকর অভিনয়ের প্রতীক্ষায়: তার স্পর্শেই আত্মতা রূপে রসে ভ'রে ওঠে; রূপকের মতো আপাত-অনুভূত তত্ত্ব-প্রাধান্যের আবরণ স'রে যায়, শ্লথ-গতি কথোপকথনের বৈঠকী আলোচনা হয়ে ওঠে দ্রুতস্রোত সংলাপের আত্মিক ঘাত-প্রতিঘাত। সংলাপ-স্রোতের সুদৃঢ় সুস্পষ্ট কল্লোল দেহেমনে তালতরঙ্গের রোমাঞ্চ জাগায়। শ্রবণে আসে, ভাবিতের মধ্যে অভাবনীয়ের, কাঙ্ক্ষিতের মধ্যে অকাঙ্ক্ষণীয়ের, কল্পিতের মধ্যে অকল্পনীয়ের অনিবার্য পরিণতির দিকে পদসঞ্চারের প্রতিধ্বনি— ঠিক যেমন ক'রে গ্রীক ট্র্যাজেডিতে দুর্নিবার দুঃসমাপ্তির ঘনিয়ে-আসা অপ্রতিরোধ্য অন্তিম প্রকাশ ঘটে। তাই "আমার সর্বনাশ"-এর কাব্যরূপ যখনই বাস্তবরূপ পায় তখনই যবনিকা। এটাই উপন্যাস চার অধ্যায়ের নাটক-সত্তা।

নাটক-সত্তা: এই পরিচয় যদি যোগ্য বলে ধরা যায় তা হলে চার অধ্যায় নাটকধর্মী উপন্যাস হিসাবে বর্ণিত হতে পারে। সেটাই তার সাহিত্যিক মূল্যায়নের উপযুক্ত মানদণ্ড হবে। একটি বিপরীত দৃষ্টান্তের সাহায্য নিলে বক্তব্যটি স্বচ্ছ হবে। Eugene O'Neill-এর দুটি বিশ্ব-বিখ্যাত নাটক— Great God Brown এবং Strange Interlude। নাটক-দুটি দুটি ভিন্ন প্রয়োগপদ্ধতির উদাহরণ। Great God Brown-এ অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের দ্বন্দ্ব মুখোশের সাহায্যে অঙ্কিত হয়েছে। ব্যক্তি-মনের বৈশিষ্ট্য— স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বহির্জীবনের প্রকাশ নানা নিয়ম-কানুনে বাঁধা, কেননা সেখানে ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীর যোগাযোগ। গোষ্ঠীর অননুমোদিত আচার-ব্যবহার নিষিদ্ধ নিন্দনীয়,

অতএব অবদমিত ; মনের ভাব 'বচসা ন প্রকাশয়েৎ'। উদাহরণ : ভাবপ্রবণতা স্ত্রীলোকের শোভা পায় কারণ তারা 'হৃদয়তাপের ভাপে-ভরা ফানুস' ; কিন্তু সেটা পুরুষের পৌরুষকে লজ্জা দেয়। এ যুগে পুরুষ বলতে যে ব্যক্তিকে বোঝায় সে শুধু man নয়, বহুবিজ্ঞাপিত he-man অর্থাৎ ষণ্ডপুরুষ। যার শিঙে যত জোর, ভাগ্যলক্ষ্মীর বরমাল্যে তার দাবি তত জোরদার। যে শিঙের খেলায় অপটু বা অরাজী সে sissy ব'লে উপহসিত। উপহাসের চপেটাঘাত এড়াবার প্রশস্ত উপায় হল : বাহিরের চেহারাকে ভেক পরানো— বিরস কাঠিন্যের, অসূয়ক বিদ্রূপের, পরদ্রোহী উল্লাসের ভেক। ভেকের কাজ হল : যে নিভৃতবাসী হৃদয় কাঙাল হয়ে বসে আছে হাত-বাড়ানো ভালোবাসার স্নিগ্ধ স্পর্শের জন্য, মাতৃগর্ভের একান্ত-নির্ভর আশ্রয়ের জন্য, তাকে আড়াল করে রাখা ; শুধু আড়াল করে রাখলেই হয় না, সজোরে তাকে অবদমিত করতে হয়। অবদমনের কাজটি অত্যন্ত দ্বন্দ্বসূচক। জীবনকেই তো চলতে হয় দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে। তাই বাহিরে দ্বন্দ্ব ভিতরে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে বর্মের প্রয়োজন : মুখোশই বর্মের কাজ করে। দয়ামায়া স্নেহ ভালোবাসা : দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এগুলি অন্তরায় ; তাই তাদের অবদমন অপরিহার্য। অবদমনের প্রচেষ্টা মানুষের সত্তা দ্বিধাবিভক্ত করে দেয় এবং তারই ফলে মুখোশের উপর এক মমতাহীন করাল ছায়া পড়ে, যেমন পড়েছিল Great God Brown-এর অন্যতম নায়ক Dion Anthonyর মুখোশের উপর— 'the appearence of a real demon'। তার ছেলেবেলার একটি ঘটনা উল্লেখ ক'রে Dion মৃত্যুর আগে মুখে-মধু ঈর্ষা-ভরা বন্ধু William Brownকে (যাকে সে 'good God' বলে ভালোবাসত) জানিয়ে যায় : "One day when I was drawing a picture in the sand he [Brown] couldn't draw and hit me on the head with a stick and kicked out my picture and laughed when I cried. I had loved and trusted him and suddenly the good God was disproved in his person and the evil and injustice of Man was born! Everyone called me cry-baby, so I became silent for life and designed a mask of the Bad Boy Pan in which to live and rebel against the other boy's God and

protect myself from his cruelty."[১] ভেকধারী ব'লে বাহিরের পরিচয়ে নেই কোনো সত্যতা, নেই কোনো অকৃত্রিম সততা।

Strange Interlude-এ নাট্যকার অন্য এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সেখানে অন্তর্লোক ও বহির্লোক, মনের কথা ও মুখের কথা পরস্পর ঠাঁই পেয়েছে: যেমন, মনের কথায় অবহেলা মুখের কথায় আপ্যায়ন, অন্তরে বিফলতার গ্লানি বাহিরে আশার আশ্বাস। মনের কথায় একটি সুবিধা এই যে, সে-কথা অপ্রকাশের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং সেই কারণেই অপরজন ঠিক ঠাহর করতে পারে না মনে কত বিচিত্র সংরাগের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। নমুনা হিসাবে একটি জটিল পরিস্থিতি নেওয়া যাক। নায়িকা Ninaর জীবনে তিন নায়ক, তিন জনেই উপস্থিত; একটা অবৈধ সম্পর্কের ফলাফল আবহাওয়াকে ঈর্ষাক্ষুব্ধ সন্দেহক্লিষ্ট করে রেখেছে; কার মনে কী সংরাগের ঢেউ আছড়ে পড়ছে তার আভাস কারুর কাছে ধরা পড়ছে না। যেমন: বাল্যসখা Charlie Marsden-এর উপস্থিতিতে Nina বিচলিত; মনে মনে ফন্দি আঁটছে কি করে Marsdenকে তার পক্ষে টেনে আনবে, কারণ "I don't feel safe…"।[২] সে ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করে, Marsden গ'লে যায়; তখন নায়িকার মনে জয়ের উল্লাস, তার স্বগতোক্তি: "…What a fool to be afraid of Charlie !…I can always twist him round my finger !" Marsden-এর মনেও কত বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বমুখী সংরাগের ঢেউ। যেমন, তার একটানা স্বগতোক্তির ক্রমানুযায়ী ভাবান্তর: 'thinking excitedly', 'Then miserably', 'Bitterly', 'Resentfully', 'In anguish', 'In a strange rage threateningly', 'Then confusedly and shamefacedly'।

দুটি প্রয়োগ-পদ্ধতি বাহির থেকে দেখলে ভিন্ন, কিন্তু অন্তরে সমধর্মী। অর্থাৎ, দুটিরই বিষয়বস্তু হল অন্তর-বাহিরের বিচ্ছিন্ন পরিচয়। বিচ্ছিন্নাবস্থা মানুষের সত্য পরিচয় নয়, আধখানা গান গাওয়ার মতো আধেক থাকে বাকি। ব্যক্তিসত্তার

---

১. "Great God Brown", *Nine Plays by Eugene O'Neill*, The Modern Library, New York, 1932, p. 346

২. "Strange Interlude", *Nine Plays by Eugene O'Neill*, p. 599

সম্পূর্ণতা উদ্‌ভূত হয় অন্তর-বাহিরের সমন্বয় হতে। O'Neill-এর প্রতিভা যে চরিত্রগুলি চিত্রিত করেছে, সাহিত্যজগতে ভাবের দিক থেকে তারা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার বিস্ময়কর সৃষ্টি। কিন্তু এই প্রয়োগ-পদ্ধতিতে যার চরণচিহ্ন পাওয়া যায় সেটা উপন্যাস। উপন্যাস দুটি পরিচয়কে স্বতন্ত্র করে বিশ্লেষণ করতে পারে, কারণ বিকীর্ণ কৌতূহল নিয়ে বিস্তীর্ণ পরিসর জুড়ে নানান দিক থেকে নানান ভাবের আবিষ্কার তার ধর্ম। কিন্তু অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকে মনের কথা এবং মুখের কথা ক্রমানুসারে ব্যক্ত করবার সুবিধা নেই সুযোগ নেই। মঞ্চে অভিনেতা, সামনে দর্শক : দ্রুতগতি নিমেষগুলির প্রবাহে সমান তালে ভেসে চলেছে তারা। মুখোশ খোলা আর পরা কিংবা মনের কথা আর মুখের কথার পারম্পর্য : এরা যেন অভিনেতার সঙ্গে অভিনেতার, অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের আত্মিক মিলনের যোগসূত্র আচমকা কেবলি ছিঁড়ে ফেলতে চায়। একক অভিনেতার কথা আলাদা— তার মনের কথার শ্রোতা শুধু দর্শক, অন্য কোনো উপস্থিতি উপদ্রবের মতো উদয় হয় না। কিন্তু অভিনেতা যখন একাধিক, তখন কি একজন আর-একজনের অগোচরে এমনভাবে কথা বলতে পারে যা শুধু দর্শকই শুনবে, পাশের লোকটির কানে কোনো আভাস পৌঁছবে না? মনের কথায় যে সংরাগ উদ্‌বেল হয়ে ওঠে, তার অতি সূক্ষ্ম চিহ্নও কি মুখাবয়বে প্রতিবিম্বিত হবে না? যদি হয়, মনের কথা আর অগোচর রইবে না; রাগ-অনুরাগ-অনুতাপের প্রতিবিম্ব অন্যজনের কাছে ধরা পড়ে যাবে। তাই যদি হয়, তবে তো নাটকের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ। আর, যদি না হয়, তবে তো সেই সংরাগ-ভরা মনের কথার অকৃত্রিম সততার লক্ষণে অতি দীন বলে প্রতিভাত হবে। এমন বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি বাস্তব-সত্যের আধার হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু সেটা ভাব-সত্যের নিখুঁত অভিব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে— এবং করেছেও।

আলোচনান্তে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যেতে পারে যে, Great God Brown এবং Strange Interlude উপন্যাসধর্মী নাটক যার ছদ্মবেশী লক্ষ্য হল ভাব-সত্যকে প্রকাশ করা। তাই তাদের সাহিত্যিক পরিচয়-বর্ণনায় বলতে হয়, তাদের সত্য উপন্যাসের নিরাকার ভাব-সত্য। কিন্তু চার অধ্যায়ের সাহিত্যিক পরিচয়-নির্ণয়ে বলা যেতে পারে নিরাকার ভাব-সত্যের সাকার বাস্তব-সত্যরূপ : এক কথায় সত্যের দুটি ধারার তুলনাহীন সার্থক সমন্বয়।

চার অধ্যায় বিপ্লবের কাহিনী, কিন্তু বৈপ্লবিক কার্যকলাপের যথাযথ প্রতিচ্ছবি নয় : এমন একটা অভিযোগ শোনা যায় কোনো কোনো মহলে। এই প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কাহিনীটি কি তথ্য-নির্ভর না সত্য-নির্ভর? সাহিত্যে তথ্য ও সত্যের পারস্পরিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ সুবিদিত। সে মতবাদ Naturalism নামক সাহিত্যবাদের অনুবর্তী নয়। তথ্য-নির্ভর হলেই রচনা যে সত্য-নির্ভর ও রসময় হয়ে উঠবে কবি তা বিশ্বাস করতেন না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য : সত্যসৃজন, তথ্যপ্রতিবিম্বন নয়। তিনি বলেছেন : "সাহিত্যে ও আর্টেও একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ, সে বস্তু যদি এমন একটি রূপ-রেখা-গীতের সুষমাযুক্ত ঐক্য লাভ করে যাতে ক'রে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য বলে স্বীকার করে, তা হলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা যদি না হয় অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁত হয়, তা হলে অরসিক তাকে বরমাল্য দিলেও রসজ্ঞ তাকে বর্জন করেন।"[১] V. S. Pritchett যাকে "fact-fetishism" আখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রোপন্যাসের শুধু আদিপর্বেই তার চিহ্ন পাওয়া যায়। যেমন, 'বউঠাকুরানীর হাট', 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি। তার পরে তথ্য-বন্দনার কাল মিলিয়ে গিয়েছিল।

সত্য হল অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ। যখন বলি সাহিত্য সত্যসন্ধ তখন এই কথাটিই বুঝি যে, সাহিত্য এক অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ খুঁজে ফেরে। বহুবিচিত্র ঘটনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের বাস্তব জীবন। এই রাশি-রাশি ঘটনাপুঞ্জ নিছক ঘটনা হিসেবে খণ্ড বিচ্ছিন্ন সামঞ্জস্যহীন অসম্পূর্ণ। তারা বাস্তব বটে কিন্তু সত্য নয়। পাড়ার মুদীর সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জানাশোনা লেনদেন : সে আমাদের বাস্তব জীবনের অঙ্গীভূত। তার সম্বন্ধে আমাদের তথ্য-নির্ভর অভিজ্ঞতা বলে, সে সোজা লোক নয় : সুযোগ পেলেই ভেজাল দেয়, মাপে কম দেয়, দাম নেয় বেশি। তার এই দীনতা এই বিকৃতি তথ্যের দিক থেকে বাস্তব হলেও সত্য বলে স্বীকৃত হতে পারে না। কারণ আমরা যেটুকু জেনেছি সে তো তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। আর তা নয় বলেই আমাদের জানা তথ্যসম্মত হলেও

---

১. "তথ্য ও সত্য", সাহিত্যের পথে, পৃ. ৫৫

সত্য নয়। মানুষটিকে জানা আমাদের তখনই সত্য হবে যখন সে অখণ্ডরূপে আমাদের মনে প্রকাশ পাবে। সত্য সক্রিয় কারণ খণ্ডতার মধ্যে অখণ্ডতা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিচ্ছিন্নতার মধ্যে যোগসূত্র বিকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য রচনা করবার ক্ষমতা তার আছে। এই প্রসঙ্গে Phenomenology-র প্রবর্তক Edmund Husserl-এর একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য : "When I see a hexahedron I say, in reality and in truth I see it only from one side. It is nonetheless evident that what I now experience is in reality more."[১] আমি তো শুধু একটা দিক থেকেই বস্তুটাকে দেখেছি। তা হলে কি করে আমি বললাম : এটা একটা ছ-কোণওয়ালা বস্তু! আমার প্রত্যক্ষকরণের মধ্যে যেটা 'more', যেটা বাড়তি অংশ, যেটাকে না হলে আমার প্রত্যক্ষকরণ অসম্পূর্ণ থেকে যেত : এই-যে 'more', এই-যে বাড়তি অংশটা : এটা কেমন করে এল, কোথা থেকে এল ? উত্তর : মনের কাছ থেকে। মনের কাজ অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ করা। কিসের মাধ্যমে! মন সৃজনশীল সমন্বয়ধর্মী। আমার ধারণায় যেগুলি শূন্যস্থান আছে সেগুলিকে পূরণ করে অভিজ্ঞতাকে নিটোল সমন্বয়-রূপ দেয়। সাহিত্যকার স্রষ্টা। তার সৃষ্টি সার্থক হয় যখন সেই সৃষ্টি গভীরতম সূক্ষ্মতম সমন্বয়ের রূপ পায়।

তাই যখন বলা হয় সত্য সাহিত্যের উপজীব্য তখন এ কথাটাই বোঝানো হয় যে, সাহিত্য গোটা মানুষটাকে সৃষ্টি করে : তার বহির্দৃষ্ট খণ্ডতা-অসংগতি-বিকৃতিময় অসম্পূর্ণ রূপকে নিপুণ শিল্পীর মতো নিটোল সুষমায় মণ্ডিত ক'রে তোলে। সেইজন্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "মানুষ আপনার দৈন্যকে আপনার বিকৃতিকে বাস্তব জানলেও সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে। রাজ্যসাম্রাজ্যের চেয়েও তার মূল্য বেশি।... সাহিত্য শিল্পকে যারা কৃত্রিম বলে অবজ্ঞা করে তারা সত্যকে জানে না। বস্তুত, প্রাত্যহিক মানুষ তার নানা জোড়াতাড়া-লাগা আবরণে, নানা বিকারে কৃত্রিম; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে, ধ্যানের

১. "Paris Lectures", *Phenomenology and Existence*, edited by Robert C. Solomon, Harper & Row Publishers, New York, 1972, p. 55

সম্পদে।"[১] এই-যে পরিপূর্ণতার রূপ: এ তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়: ইন্দ্রিয় দিয়ে কখনো সম্পূর্ণকে জানা যায় না। সাহিত্যে পরিপূর্ণ মানুষটির সাক্ষাৎ পাই, তার জৈবিক পরিচয় গৌণ। আমরা উপলব্ধি করি তার আত্মিক সত্তাকে, যে-সত্তা প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে আমাদের অগোচরে পড়ে থাকে। সাহিত্যের মানুষ তাই বাস্তব নয়, বাস্তবের প্রতিবিম্বও নয়। সে সত্য। তার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের আবিষ্কার করি, জানতে পারি, চিনি।

মানুষের আত্মিক সত্তাকে রূপ দেবার প্রয়াসেই চার অধ্যায়ের সার্থকতা। আত্মিক সত্তার প্রাণস্পন্দন জোগায় idea। Idea বলতে বোঝায় আমাদের ভাবভাবনার সেই মিলনমন্ত্র যা আমাদের আত্মাকে কোনো-এক অন্তর্গূঢ় অভাব সম্বন্ধে গভীরভাবে সচেতন করে তোলে, সেই অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে প্রেরণা জোগায়। চরিত্র মূল্যায়নে নিছক বাহিরের ঘটনা আমাদের সাহায্য করে না, বরং সৃষ্টি করে খণ্ডতা-বিচ্ছিন্নতার ধূম্রজাল যার আড়ালে মানুষের আত্মিক সত্তার পরিচয় গোপন রয়ে যায়। কিন্তু যে-ideaর প্রেরণা কর্মোদ্যমের মূলে, তাকে যদি বুঝতে পারি তবে ব্যক্তি-পুরুষের কার্যকলাপের অর্থ সহজবোধ্য হয়ে ওঠে: তার আত্মিক পরিচয়ের রহস্যরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় আমাদের মানসচক্ষে। এই কারণে চার অধ্যায়ে ঘটনার স্থান অতি গৌণ। এমন-কি, যে-কয়েকটি ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে তারা বাস্তব কিনা, তথ্যসম্মত কিনা সে প্রশ্নও বাহ্য। বিপ্লবীরা অমন করে হুইস্‌ল বাজিয়ে সংকেত পাঠাত কি না, কানাই গুপ্তের চায়ের দোকানের মতো কোনো rendezvous (পূর্বনির্দিষ্ট স্থান) তাদের ছিল কি না, অজ্ঞাতবাসের জন্য কোনো জীর্ণ পরিত্যক্ত পুজোর দালানে আশ্রয় নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব কি না: এই প্রশ্নগুলি এলা-অতীন্দ্র-ইন্দ্রনাথের চরিত্রকে হৃদয়ংগম করবার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। যে-idea ইন্দ্রনাথকে দুঃসাধ্যের সাধনায় মাতিয়ে তুলেছিল, যে-idea অতীন্দ্রনাথকে আত্মহননের বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল, যে-idea এলাকে দ্বিধা-বিভক্ত পথের মুখে দাঁড় করিয়েছিল: সেই ideaই হল চার অধ্যায়ের প্রাণস্পন্দন। ঘটনার অন্তরালবর্তী সক্রিয় ideaর রূপ ধরা পড়েছে বলেই চরিত্রগুলির আত্মিক পরিচয় উন্মোচিত হয়েছে। এইটেই

---

১. "সত্য ও বাস্তব", সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ. ৬২

চার অধ্যায়ের যথার্থ সাহিত্যিক মূল্য। অবশ্য যাঁরা সাহিত্যজগতে আচার-নীতিনিষ্ঠ তাঁদের কথা আলাদা। তাঁদের সম্বন্ধে George Lukacs-এর মন্তব্য প্রযোজ্য : "But theoreticians of modernism are also to blame for whom all literature must bear the stamp of decadent formalism."[১]

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসখানিতে যা বলা হয়েছে তার চেয়ে না-বলা অংশটি আয়তনে অনেক বড়ো। অলিখিত অংশের বাহুল্যের জন্য লিখিত অংশের মর্মোদ্ধারে বাধা উপস্থিত হয় : এ কথা কেউ কেউ মনে করেন। যে-বৈপ্লবিক আন্দোলন কাহিনীর বিষয়বস্তু তার সম্বন্ধে দু-একটি ইঙ্গিত দিয়েই বিরাট পটভূমির কাজ সারা হয়েছে। এই উনোক্তি-দোষের জন্য কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত সুবোধ্য রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি : এমন অভিমতও শোনা গিয়েছে। এখানে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন যে, বৈপ্লবিক আন্দোলনের কাহিনী লিখবার জন্য চার অধ্যায়ের সৃষ্টি নয়। কবি শুধু বৈপ্লবিক পটভূমিকায় বিপ্লবী নায়ক-নায়িকার আত্মিক বিপ্লবকেই মূর্ত করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং এই কাহিনীতে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের বিশদ বিবরণের অভাব নিয়ে অভিযোগ করলে কবির প্রতি অন্যায় করা হবে। তিনি যা লিখতে চেয়েছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচনাটির বিচার বাঞ্ছনীয়।

চার অধ্যায় মানস-জগতের কাহিনী, এ কথা আগে বলা হয়েছে। মানস-জগতের বৈচিত্র্য অশেষ ; বহির্জগতের বৈচিত্র্যের চাইতেও বহুধা ও নিগূঢ়। বাহিরের বৈচিত্র্য ইন্দ্রিয়-অধিগম্য বলে সহজগ্রাহ্য। কিন্তু মানস-জগতের বৈচিত্র্য ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সে শুধু সামগ্রিক অনুভূতির বিষয়। তাই তার মাঝে এমন এক আকর্ষণ আছে যা সাহিত্যিক মনকে মায়াবী সোনার হরিণের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎটার বাইরে টেনে নিয়ে যায়। অরূপলোকের অসীমতাকে রূপের সীমার মধ্যে সৃজন করার সাধনায় সাহিত্যকার মগ্ন হয়ে যান। এ যেন ছোট্ট শিশিরবিন্দুর বুকে সূর্যের ধরা দেওয়া। এইজন্যেই সাহিত্যের ভাষা, কবির ভাষায়, "জ্ঞানের ভাষা নয় হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা।" জ্ঞানের ভাষা শব্দ-অর্থনির্ভর। প্রত্যেক

---

১. *The Meaning of Contemporary Realism*, **Merlin Press, 1968, p.188**

শব্দের এক বিশিষ্ট অভিধান-নির্দিষ্ট অর্থ আছে। এই অর্থ স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। তথ্যকে নির্দেশ করাই তার কাজ। কিন্তু সাহিত্যস্রষ্টা শব্দের অর্থ-সীমাকে প্রসারিত করে দেয়; তার চেষ্টা সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই অসীমতাকে প্রকাশ করা। সাহিত্যের ভাষায় তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি। জ্ঞানের ভাষার সাহায্যে কোনো অনুভূতিকে সর্বকালীন সর্বজনীন অনুভূতির সামগ্রী করে তোলা যায় না। কিন্তু সাহিত্যের ভাষার সেটাই হল লক্ষ্য। এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি বলেছেন: " 'খুশি হয়েছি' এই কথাটা বোঝাতে লাগে সুর, লাগে ভাবভঙ্গি। এই কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর করে, মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসরঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়। কথার শিল্প তার ছন্দে, ধ্বনির সংগীতে, বাণীর বিন্যাসে ও বাছাই-কাজে।"[১] এমনি ক'রে সুরে ছন্দে উপমায় শব্দের মাঝে ইন্দ্রধনুর বর্ণসমারোহ যখন ফুটে ওঠে, তখন তার অর্থ অভিধানের চৌকাঠ পেরিয়ে পৌঁছে যায় অনুভূতির সীমানাহারা রাজ্যে।

অনুভূতির অন্তরে একটা অসাধারণতা আছে; তাকে ব্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে সাহিত্যের ভাষারও অসাধারণতার সাধন। এই সত্যকে বোঝাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "ভাবের সাহিত্য মাত্রেই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে ভাষা কিছু-বা বলে কিছু-বা গোপন করে, কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর। এই ভাষাকে কিছু আড় করে বাঁকা করে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলট-পালট করে তবেই বস্তুবিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্ট হতে থাকে তাকে সে প্রকাশ করতে পারে।"[২] জ্ঞানের ভাষায় সাধারণতা আছে। সেই কারণে তাকে অনেক বলতে হয়। তবু কোনো বস্তু সেখানে পূর্ণতার অনুভূতি নিয়ে সৃষ্ট হয় না। কিন্তু সাহিত্যের ভাষার অসাধারণত্বই যেন এক নিমেষে নির্দিষ্ট ভাবকে সর্বজনের অনুভাবের বিষয় করে তুলতে পারে। এই প্রসঙ্গে I. A. Richards-এর একটা মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "Language logically and scientifically used cannot describe a landscape or a face. To do so it

১. সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ. ৮

২. "সাহিত্যের তাৎপর্য", সাহিত্যের পথে, পৃ. ১৫২

would need a prodigious apparatus of names for shades or nuances for precise particular qualities. These names do not exist, so other means have to be used."[১] "Other means" হল কথার ছন্দ ধ্বনির সংগীত বাণীর বিন্যাস। কিছু বলা কিছু না-বলা, রূপকের কিছু রঙ, অর্থের স্থিতিস্থাপকতা। কেবলমাত্র Botany-র বিষয়বস্তু হয়ে থাকলে পলাশ-চাঁপা আমাদের অনুভূতির রাজ্যে অকিঞ্চিৎকর হয়ে বেঁচে থাকত। কিন্তু যেই কবির সোনার কাঠির পরশ লাগল তাদের 'পরে অমনি তারা "কিছু পলাশের নেশা / কিছু বা চাঁপায় মেশা" হয়ে আমাদের অনুভূতির রাজ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তোলে, তখন মন সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনতে শুরু করে।

কবি-স্বভাবের এই পূর্ণতাসৃজনের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার কথা অতীন্দ্রের মুখে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এলার একটি মধুর ছবি আঁকে অতীন্দ্র: "ঐ-যে তোমার দুই-একগুছি অশিষ্ট চুল আলগা হয়ে চোখের উপর এসে পড়েছে, দ্রুত হাতে তুলে তুলে দিচ্ছ, কালো-পাড়-দেওয়া তসরের শাড়ি, ব্রোচ নেই কাঁধে, আঁচলটা মাথার চুলে বিঁধিয়ে রাখা, চোখে ক্লান্ত ক্লেশের ছায়া, ঠোঁটে মিনতির আভাস, চারি দিকে দিনের আলো ডুবে এসেছে শেষ অস্পষ্টতায়। এই যা দেখছি এইটিই আশ্চর্য সত্য, এর মানে কী, কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, কোনো-এক অদ্বিতীয় কবির হাতেই ধরা দিতে পারল না বলে এর অব্যক্ত মাধুর্যের মধ্যে এত গভীর বিষাদ" (পৃ. ৮৯-৯০)। এখানে এলার যে নিরুপম ভাবময় চিত্রটি সমগ্রতা নিয়ে ফুটে উঠেছে, সে শুধু কেবল সাহিত্যের ভাষার আভাস-ইঙ্গিত ভাবের সৃজনী শক্তির দান। Anatomy-র সাত সমুদ্র, Aesthetics-এর তেরো নদী পেরিয়ে গেলেও এলার এই অবিস্মরণীয় মূর্তির আভাসটুকুও ধরা পড়বে না কোথাও।

জ্ঞানের ভাষায় ও সাহিত্যের ভাষায় যে-পার্থক্য, সেই পার্থক্য আবার সাহিত্যের মধ্যেও গদ্যে এবং পদ্যে চোখে পড়ে। তার কারণ: পদ্যে "other means"-এর স্বাধীন সঞ্চরণ। কিন্তু গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে যে ব্যবধান, বিশ্বকবির জাদুস্পর্শে সেই পারস্পরিক সীমারেখাও যেন ক্রমশ লীন হয়ে যায় তার সাহিত্যে। 'শেষের কবিতা'-র কাব্যধর্মিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি গদ্য ও পদ্যের সম্বন্ধে

১. *Poetries and Sciences*, Routledge & Kegan Paul, 1970. p. 82

নিয়ে একটি অভিনব মন্তব্য করেছেন : "এখানে আমার প্রশ্ন এই, আমরা কি এমন কাব্য পড়ি নি যা গদ্যের বক্তব্য বলেছে, যেমন ধরুন ব্রাউনিঙে। আবার ধরুন, এমন গদ্যও কি পড়ি নি যার মাঝখানে কবিকল্পনার রেশ পাওয়া গেছে। গদ্য ও পদ্যের ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদানপ্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করি নে।"[১] প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা অনুধাবন করলে এই সত্যই প্রতিভাত হয় যে, সেখানে গদ্যের গাম্ভীর্যের সঙ্গে পদ্যের বিচিত্র রসমাধুর্য সংমিশ্রিত হয়ে এক অতুলনীয় রচনাশৈলীর উদ্ভব ঘটেছে। সেই রচনাশৈলীর একমাত্র লক্ষ্য : অসীম অরূপ মানসলোককে শব্দের সীমার মধ্যে রূপায়িত করা। 'শেষের কবিতা'-য় আমরা যে গদ্যরচনারীতির অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছি, চার অধ্যায়ে তা এক রসসমৃদ্ধ পরি-পূর্ণতা লাভ করেছে।

চার অধ্যায়ের মানস-জগতে আছে অস্তমিত আশা-আকাঙ্ক্ষার রক্ত-রাঙা বিষণ্ণ-সুন্দর বর্ণালী, ভাবভাবনার উদ্‌বেল তরঙ্গোচ্ছ্বাস, অন্তর্বহ্নির লেলিহান দাহন, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের বেদনা। এক ইন্দ্রিয়-অনধিগম্য অপ্রত্যক্ষ লোক মূর্ত হয়ে উঠেছে শব্দের বৈচিত্র্যে, উপমার ইঙ্গিতে, রূপকের আভাসে, বর্ণনার দ্যুতিতে। অদৃশ্য মায়া, অনির্দেশ্য মাধুর্য, অভাবিত অনুভূতির স্পর্শ : এই নিয়ে অপ্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের অন্তর্লোকে সত্য হয়ে ওঠে। অতীন্দ্রের সঙ্গে আমাদেরও যাত্রা সেই "দীপহীন অপ্রত্যক্ষের দিকে" যেখানে আছে এলা-অন্তুর "মরীচিকার বাসরঘর", যেখানে নিষ্ফল দিনগুলি "ছায়ামূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কল্পলোকের দিগন্তে।" প্রতিটি শব্দ তাৎপর্যময়, ভাবে-রসালো, উপলব্ধির বিষয়। তারা প্রত্যেকে অপ্রত্যক্ষ জগতের দূতী; তাদের ধ্বনিতে সুরে ছন্দে ইঙ্গিতে আছে সেই জগতের মায়া-লিখন। যদি কোনো ইঙ্গিত কোনো সূক্ষ্ম রেখার ইশারা আমাদের দৃষ্টিহীন স্থূলতার কাছে হারিয়ে যায়, যদি কোনো মীড় আমাদের শ্রবণহীন প্রাণে সাড়া না পায়, তবে কাহিনীর রসসম্ভার যেন "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্" : তার অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার রূপ খণ্ড বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ অনাদৃত হয়ে পড়ে রইবে। তাই এ কথা

---

১. "গদ্যকাব্য", সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ. ৪২

নিঃসন্দেহে বলা চলে : চার অধ্যায় অভিনব মর্মস্পর্শী কাব্যধর্মী গল্পরচনা। চার অধ্যায় পাঠ কবিতা-পাঠের মতোই : শর্টকাটের কোনো উপায় নেই। কবির ভাষায় : "ওর [চার অধ্যায়] ভাষায় লাগিয়েছি জাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিষটা পায় সেটা ঠিক খাঁটি গল্পের বাহন নয়। অন্ত আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা— নবেলের নির্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয় তো দেরি হবে।"— চিঠিপত্র ১১, পৃ ১৫৪

সঘন রাত্রির মসীমাখা প্রসারিত পটভূমি। তারই বুকে দুটি পথহারা খসে-পড়া তারার রুদ্ধশ্বাসের আর্ত হাহাকার। তাদের রাত্রিশেষের প্রতীক্ষা হল অভিশপ্ত ব্যর্থ। কিন্তু ধন্য তাদের জাগরণ, ধন্য তাদের ক্রন্দন। গভীর নিশীথলগ্নে যদি শোহিনীর আলাপ জেগে ওঠে, তার সকরুণ স্বরমূর্ছনায় অনিদ্র চিত্ত কি আলোর প্রার্থনা শুনতে পায় না ?

আমাদের কাছে চার অধ্যায় সেই আলোর প্রার্থনা।

—

সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮]	১১	মানকে	মানবকে
[১৩	১	যেখানে	সেখানে
২০]	১১	astiology	aetiology
২৪]	১	তাদের	তাঁদের
২	৮	Mcintyre	McIntyre
৫	৬	অবদেমিত	অবদমিত
৬	৫	921	1921
৩০	৬	এই পরিবর্তনকে	যখন এই পরিবর্তন
৫৮	৫	আশ্রয়	আশ্রয় নেয়
	পাদটীকা	*Soeiety*	*Society*
৫৯	১১	বাঁধবেই বাঁধবেই	বাঁধবেই বাঁধবে
৬৪	২৫	আসন	আসঙ্গ
৬৮	১৫	যে	যেন
৭২	১৮	নাই	নই
	২৪	mitiary	military
৭৪	২৭	গাড়ি গাড়ি	গাড়ি বাড়ি
৭৫	২১	সংকল্পের	সংকল্পের
৭৯	১৪	পঞ্জীভূত	পুঞ্জীভূত
৮৩	৬	আত্মক্রান্তি-	আত্মক্রান্তি—
৯৭	৬	Northcota	Northcote
১০৯	১৬	উদ্‌ধৃতি	উদ্‌ধৃতি
১১৭	১৮	appearence	appearance